'মানব-প্রকৃতি,' 'মহাপ্রস্থান,' 'বিজ্ঞান-পরিচয়,' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বাস
কলেজের অধ্যাপক

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ.,
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত
১৩৩৭

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE,
CALCUTTA.

PUBLISHED BY THE AUTHOR,
St. COLUMBUS COLLEGE, HAZARIBAGH.

বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

Reg. No. 5670—March, 1931—A.

সমর্পণ

প্রাণাধিক শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ, শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র,
শ্রীমান্ শিবচন্দ্র, শ্রীমান্ মুরারিমোহন,
শ্রীমতী গৌরীবালা ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা !

তোমরা সকলে আমার সন্তান না হইলেও, সকলেই আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্,—আমার একান্ত আশার স্থল, অসীম স্নেহের পাত্র। তোমরা সবাই আমায় ভালবাস, শ্রদ্ধা কর; আমিও তোমাদের সকলকে সমভাবে স্নেহ করি, সমদৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করি। তোমাদের আদর্শেই তোমাদের অন্য ভাইবোনগুলির চরিত্র গড়িয়া উঠিবে। তাই তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আমার অন্তরের সর্ব্বপ্রধান কামনা।

এই সকল কথা ভাবিয়াই তোমাদের হাত দিয়া জীবন-যাত্রার পথ-প্রদর্শক এই **ইঙ্গিত** তোমাদেরই সকল ভাইবোনের—সারা বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীদের—কমল-করে সমর্পণ করিলাম। একটিমাত্র ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া তোমাদের মধ্যে এক জনকেও 'মানুষ' হইতে দেখিলে আমি সত্যই ধন্য হইব, আমার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিবে।—তোমরা সবাই যে আমার প্রাণের প্রাণ।

তোমাদের নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

হেম

ভূমিকা

প্রকৃতির কোমল-কঠোর অনন্ত লীলার মধ্যে যে কয়েকটি সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি এবং সেইগুলি হইতে জীবন-পথের পাথেয়-স্বরূপ যে সকল ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, বি. এ. ও শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ.-প্রমুখ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেসের সুযোগ্য প্রুফ-রিডারদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারাই সমগ্র পুস্তকের যাবতীয় প্রুফ সংশোধন করিয়া ইহাকে নির্ভুলভাবে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে মুদ্রিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন,—আমাকে কোন প্রুফ দেখিতে হয় নাই। তাঁহাদের কৃপাতেই আমি এই মহাবিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। আর সর্ব্বোপরি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অফিসিয়েটিং রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয়ের নিকটে। তিনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে এই পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যবস্থা করিয়া না দিলে ত তাঁহার প্রেসের সুদক্ষ প্রুফ-রিডারেরা ইহার মুদ্রণ-কার্য্যে তাঁহাদের যত্ন ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাকে উপকৃত করিবার সুযোগ পাইতেন না।

হাজারিবাগ,
৭ই মাঘ, ১৩৩৭ }

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones and good in everything."

—Shakespeare.

সূচী

ইঙ্গিত

দুর্ভাগ্য

সকলে এই পৃথিবীতে যে সুখ-ভোগের জন্য, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লইয়া, সুখের সংসারে জন্মায়, তাহা নহে। সকলের জীবনই যে সুখ এবং শান্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাহাও নহে। অধিকাংশ লোকই কষ্টে লালিত-পালিত হয়। নানা কষ্টের মধ্যে থাকিয়া কেহ কেহ জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করে। আবার কোন কোন লোক কষ্টের ভিতর থাকিয়াও মহা-আনন্দে কাল যাপন করে। কি করিলে কষ্টের মধ্যেও সুখ পাওয়া যায়, বলিতে পার কি ?

এ সংসারে যে যত দুঃখ পাইবে, চিত্ত তাহার ততই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট ও নিবিষ্ট হইবে। সুতরাং দুঃখ যে পায় এবং সেই দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে যে পারে, তাহাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুঃখ পাইলেই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে নাই— দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতে নাই। দুরদৃষ্টবশতঃ এই

দুঃখ পাইলাম মনে করিলেই দুঃখ "দুঃখ"; আর সৌভাগ্যের উদয় হইবে বলিয়াই, ভবিষ্যতে ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারিব বলিয়াই দুঃখ আসিয়াছে,—আমি দুঃখ ভোগ করিলে তাহার ফলে দেশের বা দশের উপকার হইবে, এরূপ মনে করিলে সেই দুঃখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া বোধ হইবে।

বর্ষাকালে বিদ্যালয় বা কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময়ে যদি কোন দিন তোমায় বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়, তাহা হইলে তুমি দুঃখ বোধ কর; নিজের অদৃষ্টকে অন্ততঃ সেই দিনের জন্যও ভর্ৎসনা কর। বৃষ্টিতে ভিজিতে হইলে দুঃখ বোধ কর, কারণ তাহা হইতে তুমি কোন বিশেষ উপকার আশা করিতে পার না। বৃষ্টি আসিয়া তোমার জুতা ভিজাইয়া তাহার কালি উঠাইয়া দিল এবং ধোপ-দেওয়া জামা-কাপড়ের পারিপাট্য নষ্ট করিল—শুধু এইটুকু ভাবিতে থাক বলিয়াই বৃষ্টি তোমার মনে দুঃখ ভিন্ন অন্য কোন ভাব জাগ্রৎ করিতে পারে না। অথচ সেই বৃষ্টির অভাবে ধান-চাষ হইবে না ভাবিয়া বৃষ্টি-পতনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক কত আনন্দিত হয়! প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও মাঠে কাজ করিতে সে দুঃখ বোধ করে না, কারণ সে জানে যে, এই দুঃখের অবসানে তাহার সুখের দিন আসিবে। দুঃখের অবসানে যে সুখ আসে, তাহার মাধুর্য্য কৃষকগণ উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই এই

রোগ-শোক-পূর্ণ দুর্দ্দিনেও তাহারা ঘরে ঘরে "নবান্নের" উৎসব সুসম্পন্ন করিয়া থাকে।

দুঃখান্তে সুখ হইবে ভাবিতে পারিলে, দুঃখ হইতেই সৌভাগ্যের সূচনা হয় বুঝিতে শিখিলে, এবং দুঃখ ভিন্ন কোন ব্যক্তির বা জাতির উন্নতি হয় না,—এমন কি দুঃখ ভিন্ন সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায় না,—এই সকল কথা ভাবিলে দুঃখকে সকল সময়ে দুঃখ বলিয়াই মনে হইবে না এবং দুঃখ পাইলে তখনই নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইবে না।

প্রলোভন

"লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু," বা "লোভসম পাপ আর নাহিক সংসারে" বলিলেই মনে হয়, কোন জিনিষের প্রতি অযথা আকর্ষণ—যাহা পাইবার আশা নাই বা যাহা পাওয়া উচিত নহে, কিংবা যাহা প্রকৃতই অশুভ অথচ মোহবশতঃ যাহাকে শুভ বলিয়া মনে হয়—এইরূপ কোন জিনিষের জন্য অত্যন্ত বেশী আকাঙ্ক্ষাই লোভ। যে লোভ আমাদিগকে কেবল পাপের পথে, ভোগের দিকে লইয়া যায়, তাহা যে কেবল একটা বাহিরের জিনিষ এবং সকল সময়ে বাহির হইতে আসিয়া আমাদিগকে বিচলিত করে, তাহা নহে। অন্তরের ভিতরেও এমন একটি কারণ আছে, যাহা সকল সময়ে আমাদিগকে সুপথ হইতে কুপথে লইয়া চলে। ইহা চিত্তের দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্যই আমাদের চিত্ত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বত্থ গাছের দিকে চাহিলেই তাহার মধ্যে দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষের ব্যবহারের অনুরূপ একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বত্থ গাছের সকল পত্র তুমি কখনও স্থির থাকিতে দেখিয়াছ কি? যখন বায়ুর গতি অনুভব করিতে পার

না, তখনও একটু লক্ষ্য করিলে দেখিবে, অশ্বত্থ পত্র কাঁপিতেছে। যখন অন্য গাছের পাতা স্থির থাকে, তখনও দেখা যায় অশ্বত্থ গাছের পাতা দুলিতেছে ; যেন তাহা দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষের মত সতত অস্থির, চঞ্চল। দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষ যেরূপ এক ভাব, এক চিন্তা লইয়া অধিক ক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, সেইরূপ অশ্বত্থ পত্রও এক অবস্থায় মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে পারে না। দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষ ও অশ্বত্থ পত্র উভয়েই সর্ব্বদা দোদুল্যমান—যেন নিজ নিজ গন্তব্য পথ বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না।

আরও দেখ, অশ্বত্থ বৃক্ষ কোন প্রাচীরের উপরে জন্মিলে দীর্ঘ মূল ভিত্তি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ স্বীয় প্রাধান্য প্রকাশ করে, সেইরূপ চিত্তের দুর্ব্বলতাও মানুষের মনে দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইলে তাহার অস্তিত্ব—এমন কি আধিপত্যও—অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। চারা অশ্বত্থের কাণ্ডটি কাটিয়া ফেলিলে কিছু দিন পরে যেরূপ মূল হইতে পুনরায় পল্লব বাহির হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এক প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিলেও চিত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ অবিলম্বেই অন্য এক প্রলোভনে পতিত হইতে হয়। আমূল উৎপাটিত না হইলে যেরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ মরে না, সেইরূপ দুর্ব্বলতাকে চিত্ত-মধ্য হইতে সমূলে নষ্ট না করিলে লোভ বিদূরিত

হয় না এবং মানুষও প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

চিত্তের দুর্ব্বলতা যখন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেয়, অথবা কষ্টকর বলিয়া যখন কোন সৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে বলে, তখন তাহা বাহিরের প্রলোভন অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথম হইতে অন্তরের এই দুর্ব্বলতা দমন করিতে না শিখিলে পরে দমন করা দূরে থাক, দমন করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হইবে না। মানসিক দুর্ব্বলতাই কর্ম্মের প্রতিবন্ধক, এবং কর্ম্ম বা পরিশ্রমে অনাসক্তিই পাপের মূল।

গ্রামের বাহিরে, নদ-নদীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। জানি না, এই প্রথা মানব-চিত্ত হইতে দুর্ব্বলতা উন্মূলিত করিতে শিক্ষা দেয় কি না। নদীতীরে বা পথের ধারে প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষ ছায়া ও আশ্রয় দান করিয়া পথিকের উপকার করে। যে চিত্তের দুর্ব্বলতা দমন করিয়া এবং বাহিরের প্রলোভন হইতে বিমুখ থাকিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করে, সে দেশের ও দেশবাসীর হিতসাধনে সমর্থ হয়।

সৌন্দর্য্য-ভোগের আকাঙ্ক্ষা

সুন্দর একটি পদ্মফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়া ফুলটি তুলিবার জন্য যেমন লোভ হইল, অমনি জলে নামিয়া ফুল তুলিতে গেলাম। একটু যাইতে না যাইতেই পাঁকে পা বসিয়া গেল। লোভের পথে বাধা পড়িল বলিয়া ফুলটি তুলিবার আগ্রহ আরও বাড়িল। আর এক বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফলে আরও বেশী পাঁকে পড়িলাম এবং গায়ে পাঁক ও কাদাজল ছিট্‌কাইয়া লাগিল। তখন নিষেধের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলাম—নিরস্ত হইলাম।

ফুলটি ফুটিলেই তাহাকে তুলিতে হইবে কেন? যত ক্ষণ ফুলটি গাছে থাকে তত ক্ষণ তাহার যেরূপ সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহাকে তুলিলে আর তাহার সেরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও কি? পাতায় ঘেরা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিলে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করে, অথচ ফুল তুলিয়া আনিলে যেন তাহার সৌন্দর্য্য আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে—তাহাকে বুকে, মাথায়, কাণে রাখিতে ইচ্ছা হয়। তাহার পর একটু শুকাইলেই, সৌন্দর্য্য এবং গন্ধ একটু কমিলেই, সেই ফুল বুক বা মাথা হইতে নামাইবার জন্য

ব্যস্ত হই। অথচ যে ফুল গাছেই শুকায় বা একটু শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, তখনও তাহার প্রতি আমরা চাহিয়া চাহিয়া দেখি।

পদ্মফুল পাইলাম না; কিন্তু বুঝিলাম, সুন্দর জিনিষ দেখিলেই ভোগের জন্য তাহাকে আপন অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করাই ভাল। পাঁকে পদ্মফুল ফোটে; দূর হইতেই সেই ফুলের শোভা দেখা ভাল। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উপভোগের জন্য সেই ফুল তুলিতে যাইতে নাই; তুলিতে গেলেই পাঁকে পড়িতে হয়। আর যদি পাঁকে নাই পড়, তাহা হইলেও অন্ততঃ দুই-এক ফোঁটা পাঁক ছিট্‌কাইয়াও গায়ে লাগিতে পারে।

পরোপকার

কোন গরীব প্রতিবেশী একদিন আমার একটি অনুরোধ রাখে নাই বলিয়া মনে মনে তাহার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার প্রতি আমার বিরক্তি যে কত বেশী হইয়াছিল, তাহা কোন দিন নিজে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই এমন একটি কারণ উপস্থিত হইল, যাহা হইতে তাহার প্রতি আমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলাম।

হঠাৎ একদিন তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দিবারাত্র সমানভাবে বৃষ্টি চলিল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু বৃষ্টির উপশম হইল না এবং দুই-এক দিনের মধ্যে যে থামিবে, এরূপ কোন লক্ষণও দেখা গেল না। সেই প্রতিবেশী আমার গৃহের সন্নিকটে খামার করিয়া তথায় কাটা ধান জমা করিয়াছিল। সেই ধান দিনের-পর-দিন জলে ভিজিতে থাকায় খড়-শুদ্ধ পচিয়া নষ্ট হইবে ভাবিয়া সে যে খুব নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অনুমান করিলাম। তাহার সেই বিপদের কথা মনে হওয়ায় আমার যে বিশেষ আনন্দ হইল, তাহা নহে;

তবে অন্য কৃষকদের ক্ষতির কথা মনে হওয়ায় তাহাদের জন্য যতটা দুঃখ হইতেছিল, আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিতে ততটা হয় নাই। সেই জন্য এত দিন প্রতীকারের কোন চেষ্টা বা চিন্তা পর্য্যন্ত করি নাই।

চতুর্থ দিন রাত্রিতে বৃষ্টি আরও বেশী জোরে আসিল। তখন হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয় সে আগামী কল্য প্রাতে আমার সাহায্য চাহিতে আসিবে এবং আসিয়া হয়ত বলিবে, "আপনার বাটীর বাহিরের দালানে ও অব্যবহৃত ঘর-গুলিতে ধান রাখিতে দিলে আমার ধানগুলি রক্ষা পায়। নতুবা পচিয়া গেলে আমার সংসার চলা ভার হইবে, পুত্র-কন্যাকে অনাহারে মরিতে হইবে, জমিদারের খাজনা দিতে জমি-জমা বাঁধা পড়িবে।"

স্থির করিলাম, যখন সে আমার সাহায্য চাহিতে আসিবে, তখন তাহার কোন উপকার করিব না। তাহাতে তাহার সারা বৎসরের খাদ্য-সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়—তাহাও ভাল। আশ্রয় দেওয়া বা অন্য কোনরূপ সাহায্য কিছুতেই করা হইবে না। যেমন সেই বিপন্নের প্রতি সামান্য সহানুভূতি পর্য্যন্ত দেখাইব না স্থির করিলাম, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পেটে একটা যন্ত্রণা বোধ হইল। সুস্থ শরীরে হঠাৎ এই যন্ত্রণা বোধ হওয়ায় প্রথমে বড় ভয় হইল, কিন্তু পর ক্ষণেই ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিলাম। তখন ভগবানের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং

তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে যন্ত্রণার উপশম হইল। যেমন হঠাৎ সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনি হঠাৎ তাহা কমিয়া গেল। তখন বুঝিলাম, যত দূর সম্ভব অন্যের উপকার করাই উচিত। নিজেকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া অর্থ, শরীর বা মনের দ্বারা পরের সাহায্য করাই মনুষ্যত্ব। স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যেই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভেদ। স্বার্থ-চিন্তা যাহার যত বেশী, পশু-প্রবৃত্তি তাহার তত অধিক। নিজের উন্নতি করিতে করিতে অন্যের উপকার তুমি যত বেশী করিবে ততই তোমার মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইবে। আর পরহিতে আত্মোৎসর্গের দ্বারা মানুষ দেবতারও ন্যায় পূজ্য হইতে পারে।

অন্যের উপকার করিবার শক্তি বা সময় যদি তোমার না থাকে, তাহা হইলে আত্মচিন্তায় বা স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকিও।—কখনও পরের অমঙ্গলের চেষ্টা বা চিন্তা করিও না। মানুষ হইয়াও পশুর মত কার্য্য করা কাহারও উচিত কি? অন্যের সহিত ব্যবহার করিবার সময়ে তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে, কিন্তু কখনও প্রত্যুপকারের আশা রাখিও না; কিংবা সে কিরূপ ব্যবহার করিবে সে চিন্তা পর্য্যন্ত কখনও করিবে না। অন্যের উপর তোমার সামান্য প্রভুত্ব, সামান্য ক্ষমতা

আছে বলিয়া যদি কোনরূপে তুমি তাহার ক্ষতি কর, তাহা হইলে অনন্তশক্তিশালী ভগবান্ তোমার কত ক্ষতি করিতে পারেন, বল ত ?

ভগবানের অসীম শক্তি বিশ্বের হিতসাধনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই বিশ্বপতির কৃপাপ্রার্থী হইয়া তুমি অন্যের প্রতি করুণা-প্রদর্শনে কৃপণ হইবে কেন ? পরহিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ তুমি যত ত্যাগ করিবে ততই তোমার চিত্ত স্থির হইবে, মনে দৃঢ়তা আসিবে এবং কল্যাণ-সাধনের প্রবৃত্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে। তখন তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে; দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম ও স্মৃতি ইহ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

ছলনা

একদিন দেখিলাম, একটি বালক তাহার সম্মুখস্থিত মধ্য-বয়স্ক একটি লোককে বলিতেছে, "তুমি দিবে বলিয়া শেষে দিলে না কেন ?" এই কথা কয়টি দুই-তিন বার বলিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিল এবং অতিকরুণ স্বরে বলিল, "আমায় আশা দিয়া নিরাশ করিলে কেন ?"

বালকের কথায় সেই লোকটি কি উত্তর দিল তাহা শুনিলাম না ; শুনিবার জন্য কোন আগ্রহ হইল না। কেবল সেই বালকের কথা কয়টি আমার কাণে বাজিতে লাগিল। মনে হইল, প্রত্যহ যে ভাব সকল লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আজ তাহাই বালক অতিসরল—স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিল। সত্যই কি আমরা সংসার-মধ্যে এরূপ অভিযোগ প্রত্যহ শুনিতে পাই না ? আমরা যাহা আশা করি, তাহা সকল সময়ে পাই কি ? একজন প্রাণপণ যত্নে পরিশ্রম করিয়া তোমার কাজ করিলে তুমি তাহার আশানুরূপ প্রতিদান দাও কি ? তুমি দাও না। সেই জন্যই দেখ, গরীব শ্রমজীবিগণ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও নিজ নিজ পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। আমরা

তাহাদিগকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করি। এইরূপে নানা ভাবে আমরা ছোট ছোট ছেলেদের বা আশ্রিতদের সহিত ছলনা করি। আবার বড় যাঁহারা, তাঁহারাও আমাদিগকে অল্প-বয়স্ক বা অল্প-বুদ্ধি দেখিয়া. আমাদের সহিত ছলনা করেন। এইরূপ ছলনার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় থাকিলে তাহাকে নীচতা বলা হয়; আর যেখানে লাভালাভের কোন বিচার থাকে না, সেখানে ছলনা স্নেহের রূপান্তর মাত্র।

বালক কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহার কান্নার মধ্যেও যেন একটু আব্দারের ভাব ছিল। যে তাহার সহিত ছলনা করিয়াছিল, বালক সেই প্রতারকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয় নাই। সে সেই কান্নার ভিতর দিয়া যেন মনের এই ভাব প্রকাশ করিতেছিল—'আমার ন্যায্য প্রাপ্য যথাযথভাবে মিটাইয়া দাও এবং যত ক্ষণ না দিবে তত ক্ষণ তোমায় ছাড়িব না।' সেই জন্যই দেখিলাম, বালক যত কাঁদিতেছিল ততই সে সেই ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিতেছিল।

মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তি ও বালকের ব্যবহার সেই দিন যেরূপ দেখিলাম তাহা হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, ভালবাসা থাকিলে, স্নেহ থাকিলে এক জন অন্যের সহিত ছলনা করে। আমরা অনেক সময়ে ছলনার অন্তর্নিহিত ভালবাসা বুঝিতে পারি না বলিয়াই প্রতিদান না পাইলে "ছলনা

করিল” বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করি। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তুমি যে ছেলেটিকে যত বেশী ভালবাস, তাহার সহিত তত বেশী ছলনা কর। এই জন্যই দেখা যায়, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যেখানে ভালবাসা যত কম, সেই খানেই আদান-প্রদানের আড়ম্বর তত বেশী। আমরা অনেক সময়ে এই সত্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু দেখিবে, বালকেরা স্বভাবতঃ স্নেহের এই মর্ম্ম বুঝিতে পারে। যে শিশু তোমার স্নেহ বুঝিতে পারে, সে তোমার ছলনা দেখিয়া নিরাশ না হইয়া আরও কিছু বেশী পাইবার আশায় নানা চেষ্টা করে। এই জন্যই মার ছলনায় সন্তান তত কাঁদে না—যত অন্যের ছলনায় কাঁদে।

ভগবান্‌ও তাঁহার সন্তানের সহিত এরূপ ছলনা সকল সময়ে করেন। তিনি যাহাকে যত বেশী ভালবাসেন, তাহার সহিত তত বেশী ছলনা করেন। আপন প্রিয় সন্তানকে আনন্দ ও শান্তির পথ দেখাইয়া, তাহার প্রাণে পারত্রিক মঙ্গলের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া, তাহাকে সকল কর্ম্মে সাহায্য করিয়া, সময়ে সময়ে তাহাকে হাতে ধরিয়া সৎ পথে লইয়া গিয়া, আবার কখন-বা সংসারের সকল ভোগ-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া, অবশেষে তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যান। তখন ভক্ত ভগবান্‌কে আর পায় না। তখন সে চতুর্দ্দিকেই প্রতিকূল আচরণ দেখিতে পায়,

সকল অবস্থায় ইচ্ছার বিরোধী ঘটনা ঘটিতে দেখে। তখন তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়, উৎসাহ প্রায় লোপ পায়। ইহা কি পরীক্ষা নহে?

ভগবান্ ভক্তের ভক্তি ও অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্যই কি এইরূপে তাহার সহিত ছলনা করেন না? ইহাও তাঁহার দয়া। ইহা বুঝি না বলিয়াই আমরা কাঁদি। কোন জিনিষ পাইবার আশা করিয়া বা হাতে পাইয়াও যদি না পাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আরও বড় জিনিষ ভবিষ্যতে পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। চেষ্টা করিলে এবং ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিলে এমন জিনিষ আমরা নিশ্চয়ই পাইতে পারি, যাহা কখনও দেখি নাই, কখনও শুনি নাই এবং কখনও ভাবি নাই।

ভরসা

কোন একটি অন্যায় কার্য্য করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মন নিতান্ত অস্থির, একটুও শান্তি ছিল না। কেবল মনে হইতেছিল, এত চেষ্টাতেও যখন দুষ্প্রবৃত্তি মন হইতে তাড়াইতে পারিলাম না, তখন আমার মত লোকের দ্বারা কি ভগবানের পূজা-আরাধনা হইতে পারে? এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি যাহার চিত্তে জাগিয়া উঠে, সে কি কখনও চিত্ত শুদ্ধ করিয়া সৎ চিন্তা করিতে পারে, না সৎ চিন্তা করিবার অধিকার তাহার থাকিতে পারে?

ক্ষুব্ধ চিত্তে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে গঙ্গার পাড় হইতে একটি বড় মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া জলে পড়িল। গঙ্গার নির্ম্মল জল ঘোলা হইয়া গেল। জল ঘোলা হইতে দেখিয়াই কেমন একটা ঔৎসুক্য হইল। কত ক্ষণ সেই জল ঘোলা থাকে জানিবার জন্য স্রোতের পিছু-পিছু নদীতীর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু অল্প ক্ষণ যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, সেই ঘোলা জল নির্ম্মল হইয়া গেল। কাদা, মাটি, বালি শীঘ্রই থিতাইয়া গেল এবং সেই ঘোলা জল পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার হইল।

ছুটিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আসিলাম—দেখিলাম, সে স্থানেও ঘোলা জলের চিহ্নমাত্র নাই। তখন একটু ভরসা হইল; মনে উৎসাহ আসিল।

যাহা দেখিলাম তাহা হইতে এই শিক্ষা হইল যে, চিত্তে দুস্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। সময়ে সময়ে দুস্প্রবৃত্তি জাগিলেই যে আর ভাল হইবার কোন আশা থাকে না, তাহা নহে। দুস্প্রবৃত্তি জাগিলেই চেষ্টা করিয়া সেই প্রবৃত্তি দমন করিতে হইবে। ভাল চিন্তা, ভাল কাজ ও পড়াশুনার দ্বারা সেই কুপ্রবৃত্তি মন হইতে তাড়াইতে হইবে। কুপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইলে, ক্ষণিক উত্তেজনা দমিত হইলে, পর ক্ষণেই সৎ প্রবৃত্তি জাগ্রৎ হইবে এবং তখন চিত্ত আবার নির্ম্মল হইবে। সৎ কর্ম্ম ও সৎ চিন্তার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হইলে সেই বিশুদ্ধ চিত্ত সাধনা ও আরাধনার উপযুক্ত হইবে।

ভগবানের এই আদেশ পাইয়া যখন গঙ্গার দিকে চাহিলাম তখন তাঁহার পতিতপাবনী মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহার আশ্বাসবাণী যেন আমার কর্ণে এইরূপ ধ্বনিত হইল—'আমাকে দর্শন করিলে মনের ক্ষোভ দূর হইবে, স্পর্শ করিলে পবিত্র হইবে, এবং এই জলে অবগাহন করিলে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইতে পারিবে। তখন আর সৎ কার্য্য করিবার কোন বাধা থাকিবে না; তখন তুমিও পূজা-আরাধনার উপযুক্ত হইবে।'

বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গঙ্গাতীরে দাঁড়াইলাম এবং পরে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলাম। নিমেষ-মধ্যে আমার মনের ক্ষোভ দূর হইল। তখন অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব্ব উৎসাহ জন্মিল। সেই দিন হইতেই আমি ভাল হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বঞ্চনা

যে যাহা চায়, সে তাহা পায় না। শুধু আমরা কেন, ভগবান্ পর্য্যন্ত সময়-বিশেষে আপন বাঞ্ছিত পদার্থ লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন। ভগবান্ আপন কার্য্য সাধন করিবার জন্য কোন মহাপুরুষের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য জন-সমাজে জানাইয়া থাকেন। সেই মহাপুরুষের মুখে তুমি-আমি তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া, হিতাহিত বুঝিতে পারিয়া আমরা আপন আপন কর্ত্তব্য স্থির করি। তখন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জানিতে পারেন যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মহাপুরুষ কত আশা করেন, ভগবান্ কত তুষ্ট হয়েন।

সাধারণতঃ দুই দিন যাইতে না যাইতেই কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্য ত্যাগ করি, আপন আপন প্রতিজ্ঞাও ভুলিয়া যাই। যখন আমরা কর্ত্তব্য ভুলিয়া, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের পথ ছাড়িয়া আবার গতানুগতিক-ভাবে দিন কাটাইতে আরম্ভ করি, তখন কি সেই মহাপুরুষকে বা ভগবান্‌কে বঞ্চিত করা হয় না? সাধারণ মানুষ এই

ভাবে এক বার বঞ্চিত হইলে আর দ্বিতীয় বার কথা বলে না, কাহাকেও কোন অনুরোধ করে না এবং শিথিলতা-বশতঃ সময়ে সময়ে নিজেও সেই কাজ ত্যাগ করে। ক্বচিৎ তাহাকে প্রতীকারের চেষ্টা করিতে দেখা যায়। কিন্তু জনসাধারণ কর্ত্তৃক উপদেশ প্রত্যাখ্যাত হইলে মহাপুরুষ ভগ্নোৎসাহ হয়েন না। অন্তরের ক্ষোভ গোপন করিয়া সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও আগ্রহ জাগাইয়া দিবার জন্য তিনি পুনরায় দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়া থাকেন। আর যিনি সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মঙ্গলময় ভগবান্, তাঁহার কিছুতেই ক্ষোভ হয় না। তাই দেখি—

ভগবান্ অহর্নিশ বাঁশী বাজাইয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন। ডাকিতেছেন, তাঁহার নিজের সুখ বা সুবিধার জন্য নহে; ডাকিতেছেন, আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। অথচ আমরা সে ধ্বনি শুনি কি? শুনিয়াও যে শুনি না। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, সুজন্মা-অজন্মা প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা দেখাইতেছেন যে, তিনিই সকলের প্রভু, তিনিই নিয়ন্তা। কিন্তু আমরা তাঁহার সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করি কি? আমরা তাঁহার বিধি পালন করিয়া জীবন যাপন করি কি? আমরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহি কি? প্রাকৃতিক মোহন দৃশ্য, জীবের রক্ষা ও পালনের জন্য প্রকৃতির দানরূপ তাঁহার বংশী-ধ্বনি শুনিয়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, অকালমৃত্যু প্রভৃতি ইঙ্গিত হইতে

তাঁহার অবস্থিতি বুঝিয়াও যে আমরা তাঁহার দিকে যাই না। আবার সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াও যে ফিরিয়া আসি। এইরূপে তাঁহার সহিত আমরা সকল সময়ে বঞ্চনা করিতেছি; অথচ তাহাতেও তিনি আমাদিগকে নিজের কাছে ডাকিতেছেন; আমাদের অভাব মোচন করিতেছেন, কত ভাবে কত সুবিধা করিয়া দিতেছেন। আমাদের হস্তে ভগবান্‌কে যে ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়, অন্যের নিকটে তোমাকে সে ভাবে বঞ্চিত হইতে হইলে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতে কি?

পশুত্ব

একদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম, আমার সাধের বাগানে ছাগলে গাছপালা খাইতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া ছাগলটিকে ধরিলাম এবং কিছু খাইতে না দিয়া তাহাকে কয়েক ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলাম। কিছু ক্ষণ বাঁধা থাকিতে না থাকিতেই সে ডাকিতে আরম্ভ করিল। তাহার ডাক শুনিয়া মনে হইল যেন সে কেবলই বলিতেছে, 'আমি কি অন্যায় করিয়াছি? আমি পশু, তাই পশুর মত ব্যবহার করিয়াছি।'

যখন এই চিন্তাটি অন্তরে জাগিল, তখন একটু বিচার করিয়া দেখিতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকৃতই ছাগলটি কোন দোষ করে নাই। সে পশু, সুতরাং বিচার-শক্তি-শূন্য। সেই জন্য সে পরের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ না ভাবিয়া আপন সুখের জন্য গাছের ডগা, কচি পাতা, ফুল ও ফল খাইয়া পেট ভরাইয়াছে। ঘাস ও সাধারণ লতাপাতা খাইয়া পেট না ভরাইয়া আমার এই সুন্দর সুন্দর গাছগুলি খাইয়াছে বলিয়াই-না তাহার উপর আমার এত রাগ!

বেশ, ছাগলের ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাই সে আসিয়া

আমার ইষ্ট-অনিষ্ট না দেখিয়া গাছ খাইয়াছে। সেই জন্যই তাহার আজ এই শাস্তি। আর যখন হিতাহিত-জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা নানারূপ কৃত্রিম ক্ষুধা সৃষ্টি করিয়া সেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্যের সুবিধা-অসুবিধা না দেখিয়া কার্য্য করে, আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের ক্ষতি করে, প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া কেবল বড়লোক হইবার আগ্রহে যখন সে পরের অন্ন-সংস্থানের উপায়টুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে দ্বিধা করে না, তখন তাহার কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত? ছাগল 'ব্যা-ব্যা' করিয়া ডাকিয়া আপন পশুত্বের পরিচয় দিতেছিল। কিন্তু মানুষ যখন পশুর মত ব্যবহার করিয়াও আপনাতে মনুষ্যত্বের আরোপ করে, তখন সে কি পশু অপেক্ষাও ঘৃণ্য নহে? ছাগলের উপর আমার শক্তি আছে বলিয়াই আমি তাহাকে এই সাজা দিলাম—জানি না, মানুষের উপর যাঁহার শক্তি আছে, তিনি আমাদের এইরূপ স্বার্থান্ধ, ভোগাসক্ত পশু-বৃত্তির জন্য কোনরূপ শাস্তি বিধান করেন কি না।

ভগবানের দয়া

তখন গ্রীষ্মকাল। মধ্যাহ্ন-কালের দারুণ রৌদ্রে চারি দিক্ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সে দিন কর্ম্মস্থানে যাইতে হয় নাই বলিয়া আহারাদির পর আরাম করিয়া একটু শয়ন করিয়াছিলাম। ঠিক তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, এমন সময়ে শুনিলাম, কে যেন বাহিরে আস্তে আস্তে বলিতেছে, "বাবু হৈ, বাবু হৈ?" 'এই দুপুর বেলা কে আবার আসিল' বলিয়া একটু বিরক্তির সহিত উঠিয়া গেলাম এবং দরজা খুলিয়া দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসী বাহিরে বসিয়া আছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার ভাগ্য বড় ভাল বলিয়াই আজ সাধু তোমার বাড়ীতে আসিয়াছে। আমার কোন সৎ উদ্দেশ্য আছে। যাহাতে সেই কার্য্য সফল হয়, তাহার জন্য কিছু অর্থ-সাহায্য চাহিতেছি।" তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া ভিতরে আসিলাম এবং এক আনা পয়সা লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। সাধু বলিলেন, "তুমি এক আনার বেশী দিতে পারিতে, কিন্তু এখন বিরক্ত হইয়া গিয়াছ বলিয়া বেশী দিলে না। যাহা হউক তুমি যে কিছু দিয়াছ

তাহাতেই আমি খুসী হইয়া যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন। সাধুর এই আগমনে আমার যে কি সৌভাগ্য সূচিত হইল, তাহা বুঝিলাম না। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া শুইলাম। শীঘ্রই নিদ্রা আসিল।

কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, একটি কঙ্কাল-সার গরু রৌদ্রের সময়ে জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়াই মনে হইল, যেন সে কি চাহিতেছে। বাহিরে আসিয়া একটি খালি বাল্‌তি দেখাইলাম। গরুটি উৎসুকভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বাল্‌তি করিয়া জল লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলাম। নিমেষের মধ্যে গরু সেই জল পান করিল দেখিয়া আমার শিশু-কন্যা জল আনিয়া আনিয়া বাল্‌তিতে ঢালিতে লাগিল। গরুটি তিন-চার বাল্‌তি জল পান করিল। তাহার পর আমার কন্যা তাহাকে কিছু কচি ঘাস তুলিয়া খাইতে দিল। ঘাস খাইয়া গরু পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

আমার কন্যার আনন্দ দেখিয়া এবং নিজের তৃপ্তি অনুভব করিয়া মনে হইল যে, আমাদের জীবনের সেই দিনটি সার্থক করিবার জন্যই গরুটি আসিয়াছিল। সে পশু— মুখফুটিয়া কিছু চাহে নাই। তথাপি তাহার অভাব বুঝিয়া একটু উপকার করিতে পাওয়ায় কত আনন্দ পাইলাম।

তখন বুঝিলাম যে, সৌভাগ্য না থাকিলে অন্যের উপকার করা দূরে থাক, উপকার করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত আসে না। সুতরাং উপকার করিবার সুযোগ আসিলেই বুঝিতে হইবে যে, সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, ভগবান্ দয়া করিয়াছেন।

তখন সেই সাধুর কথা মনে হইল। তাঁহাকে রৌদ্রের সময়ে হাত-পা ধুইবার জল দিই নাই, পিপাসা পাইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করি নাই এবং তাঁহাকে আবশ্যকমত সাহায্য করিয়া পরিতুস্ট করি নাই বলিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম। তখন সেই সাধুর কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলাম। বুঝিলাম, প্রার্থীর কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুযোগ যাহার আসে, সে ভাগ্যবান্; আর যে সেই যাচকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে, তাহার জীবন ধন্য।

সুতরাং, ভিক্ষার উদ্দেশ্যে তোমার নিকটে কেহ আসিলেই বুঝিতে হইবে যে, তোমার দ্বারা ভিক্ষার্থীর অভাব মিটিতে পারে জানিয়াই ভগবান্ তাহাকে অন্যের নিকটে না পাঠাইয়া তোমার গৃহে আনিয়াছেন। যদি তুমি তাহার অভাব মোচন করিতে পার, তাহা হইলেই ভগবানের আশা পূর্ণ হইবে, তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। তখনই তুমি তাঁহার প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতে পারিবে। আর তখনই ভগবানের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। ভগবান্ দয়া করিয়া অতিথিরূপে আসিয়া তোমার সেবা গ্রহণপূর্ব্বক তোমায় কৃতার্থ করিবেন।

তখন বেশ ধারণা হইল যে, শুধু পূজা-আরাধনায় ঈশ্বর-সেবা হয় না,—দরিদ্রের সেবাই ঈশ্বর-সেবা। তাহাদের প্রতি প্রদর্শিত সদয় ব্যবহার ও সহানুভূতিই ঈশ্বর-প্রীতি এবং তাহাদের সহিত সম্মেলনই ভগবানের সহিত সম্মেলন। তখন সুস্পষ্ট বুঝিলাম—

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আকস্মিক বিপদ্

কালবৈশাখীর দিনে দুপুর বেলা একদিন দেখিলাম যে, মাঠের উপর কালো মেঘে আকাশ ঘিরিয়া ফেলিল। আকাশের মাথার উপর তখনও রৌদ্র ছিল বলিয়া আকাশের কোলে মেঘ আরও কালো দেখাইতেছিল। সেই অতিবিস্তৃত মাঠের কালো গাছের বেড়ের উপর কালো মেঘের স্তর এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিল। অল্প ক্ষণ পরেই মেঘ ছড়াইতে আরম্ভ করিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বাতাসের জোর তখনও অনুভব করি নাই, কিন্তু অত শীঘ্র মেঘ ছড়াইয়া পড়িল দেখিয়া বুঝিলাম যে, জোর বাতাস উপরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নীচে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। হঠাৎ দেখিলাম, দূরে একটি গ্রাম হইতে ধোঁয়ার মত কি যেন বাহির হইতে আরম্ভ হইল এবং একই স্থান হইতে কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই-এক জন লোক মাঠ দিয়া চলিতেছিল, তাহারা ধোঁয়া দেখিয়া বলিয়া গেল, "ঐ গ্রামে আগুন লাগিয়াছে—ঘর-বাড়ী জ্বলিতেছে, তাই এত ধোঁয়া উঠিতেছে।" প্রকৃত ঘটনা কি জানিবার জন্য কেহই দাঁড়াইল না। নিকটবর্ত্তী

একটি গ্রামে আশ্রয় লইতে যে যত শীঘ্র পারিল চলিয়া গেল।

দেখিলাম, গ্রামে আগুন লাগে নাই। আগুন লাগিলে পিছনে কালো মেঘ থাকায় নিশ্চয় তাহার শিখা দেখিতে পাওয়া যাইত এবং ধোঁয়া ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু ধোঁয়া না ছড়াইয়া জমাট হইয়া একই স্থানে যখন একটা কালো প্রকাণ্ড থামের মত স্থির রহিল, যখন সেই কালো থাম মেঘের সহিত মিশিয়া একটি বিরাট্ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল, তখন বুঝিলাম ঘূর্ণিবায়ুতে ধূলা-বালি উড়িয়া এই অপূর্ব্ব থামের মত পদার্থ তৈয়ার করিয়াছে। প্রায় দুই-তিন মিনিট স্থিরভাবে থাকিয়া ধূলা-বালি-পূর্ণ সেই ঊর্দ্ধগামী বায়ুস্রোত ক্রমশঃ মোটা হইতে লাগিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আসিল। তখন আমি প্রাণ-ভয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে ছুটিলাম।

দেখিলাম, মাঠের মধ্যে একটি গাছ-তলায় কতকগুলি বালক ও যুবা হিন্দীতে কি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, কেহ বলিতেছে, "হে ভগবান্, তোমার পায়ে পড়ি ;" কেহ-বা বলিতেছে, "দয়া কর, ভগবান্।" তখন আমিও ভগবানের নাম করিতে করিতে এবং মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পুনরায় ছুটিলাম।

আকস্মিক বিপদ্

যখন পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে এক ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, যখন আকাশ ঝড়, বৃষ্টি ও শিলারূপ অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তখন এক কুটির-দ্বারে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলাম। তখন ভাবিলাম, জ্ঞানলাভ ও সাধুসঙ্গ যদি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে বিপৎপাতই বা শুভ বলিয়া বিবেচিত না হইবে কেন? জ্ঞানলাভ ও সাধুসঙ্গ হইলে মানুষ ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে ও তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে শিখে। বিপদ্ আসিলে যখন সেই ভগবান্‌কেই স্মরণ করিবার কথা মনে পড়ে, তখন বিপদ্‌ও আমাদের বাঞ্ছনীয় না হইবে কেন? বিপদ্ না আসিলে প্রাণের আবেগ, চিত্তের দৃঢ়তা ও অনুরাগের পরীক্ষা হয় না। বিপদে পড়িয়া যে মঙ্গলময় ভগবানের বিধানে বিশ্বাস রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, অবিলম্বেই সে তাঁহার করুণা লাভ করিয়া থাকে। সেই করুণার বলে ইহ জীবনেই সে আনন্দ ও শান্তি পাইতে পারে।

সম্পদ্ ও সুখের সময়ে মানুষের চিত্তে এরূপ চাঞ্চল্য আসে যে, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। উৎসবের সময়ে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই তাহার আয়োজনের সদ্ব্যবস্থায় কত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কত লোকের সাহায্য

সত্ত্বেও বিশেষ কোন শৃঙ্খলা উৎসব-আনন্দের মধ্যে প্রায় কোথাও দেখা যায় না। সুখ-ভোগে চিত্ত অসংযত হয় এবং সম্পদে ও আমোদে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায় বলিয়াই উৎসবের দিনে বা কোন পর্ব্ব-উপলক্ষে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য ভোগ-বিমুখ, ত্যাগ-পরায়ণ কর্ম্মীর যত আবশ্যক হয়, দুঃখের দিনে বা বিপদের সময়ে তাহার শতাংশের একাংশও আবশ্যক হয় না। দুঃখে সাধারণতঃ চিত্ত সংযত ও অচঞ্চল হইয়া থাকে। সেই জন্য দুরবস্থায় পড়িলে সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে। দুঃখের সময়ে একের অধিকার অন্যে লইতে তত ব্যগ্র হয় না এবং সেই কারণে শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করিতে হয় না।

আরও দেখ, বিপদের সময়ে লোকের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন হওয়ায় প্রত্যেকে বিপন্নিবারণের পথ দেখিতে পায়। তখন এমন এক শক্তি আসে, যাহা মানুষ সম্পদের সময়ে ধারণাও করিতে পারে না। তখন এমন এক সাহস আসে, যাহা উত্তরকালে বিস্ময় উৎপাদন করে। বিপদে চিত্তের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়, শক্তি জন্মায় এবং ভগবানে নির্ভরতা আসে বলিয়াই বিপদ্ আমাদের প্রকৃত বন্ধু, দুঃখ আমাদের হিতকারী।

মানুষের মন

একদিন পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সঙ্গে দুই-চারিজন লোক ছিল। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে কখনও পরিভ্রমণ করে নাই বলিয়া আমার সঙ্গীদের একটু ভয় হইতেছিল। তাহাদের ভয় বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলাম, "এ-সব জায়গায় আমি অনেক বার আসিয়াছি। বলিতে কি, এখানকার গাছ-পাথর পর্য্যন্ত সবই আমার চেনা।" এই কথায় তাহাদের সকলের একটু ভরসা হইল এবং আমার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পাহাড়ে উঠিতে সম্মত হইল।

পাহাড়ে উঠিবার জন্য যখন সকলে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, তখন দূর হইতে দেখাইয়া বলিলাম, "ঐ আম গাছের কোল দিয়া, ঐ বড় পাথরখানির পাশ দিয়া প্রথমে যাইতে হইবে। তারপর ঐ শাল গাছের তলা দিয়া, ঐ পাথরখানির উপর দিয়া উঠিতে হইবে।" যে ভাবে বলিলাম, তাহা হইতে তাহারা বেশ বুঝিল, যেন আমি সবই জানি এবং আমিও মনে করিলাম, অনেক বার দেখিয়াছি বলিয়া এত দিনে সবই বেশ চিনিতে পারিয়াছি।

সকলকে লইয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। একটু যাইতে না যাইতেই সম্মুখে একটি কাঁটার ঝোপ আসিয়া পড়িল। সেই ঝোপের পাশ দিয়া গিয়া একটি লতায় জড়ান দুই-চারিটি আগাছা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে একটি নালা রহিয়াছে। নালার পাশ দিয়া একটু যাইতে না যাইতেই এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত গাছ, পাথর প্রভৃতি চিহ্নগুলি প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন নূতন গাছতলা দিয়া গিয়া নূতন পাথর পার হইয়া পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ফলে, কাঁটায় কাহারও হাত-পা ছড়িল, কেহ বা হুচট্ খাইয়া আঙ্গুল কাটিল, পাথরে হড়্কাইয়া কাহারও বা ছাল-চাম্ড়া ছিঁড়িল। সে দিন আমাদের আর পাহাড়ে চড়া হইল না।

অর্দ্ধেকও উঠিতে না পারিয়া যখন পাহাড় হইতে নামিতেছিলাম, তখন আমার মুখে আর কোনও আস্ফালন ছিল না। কেবল, "কি জানি আজ কি হ'ল, কি জানি!"—এইরূপ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা বলিতে বলিতে আস্তে আস্তে নামিলাম।

যখন নামিয়া আসিলাম তখন এক নূতন চিন্তা আসায় মনের নিরানন্দ ভাব চলিয়া গেল। তখন মনে হইল, দূর হইতে কোন মানুষের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া যেমন তাহাকে চিনিতে পারা সম্ভব, তেমনি পাহাড়ের চেহারা দেখিয়া দূর হইতে কোন্‌টি কোন্

পাহাড় এবং কোন্ খানে কি আছে, বলিতে পারা যায়। কিন্তু যেমন পাহাড়ের গায়ে কোন স্থানে দাঁড়াইলে সব পাহাড়টাই এক বলিয়া মনে হয়, তেমনি সামান্য ঘনিষ্ঠতা হইলে সকল মানুষকেই সমান বলিয়া বোধ হয়। আবার যেমন পাহাড়ে উঠিবার সময়ে প্রতি পদে নূতন গাছ, নূতন পাথর, নালা, ভাঙ্গন প্রভৃতির সম্মুখে আসিয়া পড়িতে হয়, সেইরূপ কোন মানুষকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, তাহার প্রকৃতি বুঝিতে গেলে প্রতিদিনই নূতন নূতন ঘটনা, নূতন নূতন ব্যবহার চোখে পড়ে এবং সেই জন্য প্রত্যহই তাহার সম্বন্ধে নিজের মতের বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সাধারণের পক্ষে পাহাড়ের পথ-ঘাট চিনিয়া রাখা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ কোন লোকের মন সম্যক্ চিনিতে পারাও প্রায় অসম্ভব। আবার যেমন পাহাড়ের গাছ, পালা, পাথর, নালা সব চিনি বলিয়া আস্ফালন করা উচিত নহে, তেমনি অমুকের সহিত আমার জানাশুনা আছে বা অনেক বার মিশিয়াছি বলিয়া তাহার মন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি কিংবা তাহার প্রকৃতি চিনিতে পারিয়াছি, এরূপ বলাও কখন উচিত নহে। মানুষের মন পর্ব্বতের মতই বিশাল, কিন্তু পরিবর্ত্তন-শীল। যাহা বিশাল তাহা আয়ত্ত করা যায় না বলিয়াই কাহারও মন প্রকৃতভাবে কখনও চিনিতে পারা যায় না।

বিশেষত্ব

সীতাগড় পাহাড় হাজারিবাগ সহরের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। তাহার নীচে পশু রাখিবার জন্য জৈনদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি গোশালা আছে। পাহাড়ের গায়ে ও তলায় নানা রকমের গাছপালা দেখিতে পাওয়া যায় এবং আশে-পাশে শাল প্রভৃতি গাছের ঘন বন। এক-দিন গোশালা দেখিয়া সীতাগড়ের পার্শ্বের পথ দিয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

যে খানে যাইতেছিলাম, সেই খানেই যত দূর নজর চলিতেছিল, তত দূর শুধু ছোট-বড় নানা রকমের গাছ-পালা দেখিতেছিলাম। কাছে দাঁড়াইলে তাহাদের বিভিন্ন আকার, বিবিধ বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন ফুল, নানা প্রকার কাণ্ড ও তৎ-সংলগ্ন হরেক রকমের লতা দেখা যাইতেছিল। কিন্তু অল্প দূর হইতে তাহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতাই দেখা যায় নাই—সকল গাছই সমান বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক স্থানে তিনটি নাগেশ্বর গাছ দেখিলাম। অথচ সেই দুষ্প্রাপ্য গাছও আমার নয়ন-মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

বনের আশে-পাশে কিছু ক্ষণ থাকিয়া সেই একই ধরণের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমি কেমন একটা জড়তা অনুভব করিলাম। তখন মনের আনন্দ ক্রমশঃই দূর হইয়া গেল এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আসায়, চতুর্দ্দিক্‌স্থ দৃশ্যের প্রতি বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মনুষ্য-সমাজ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির কোলে আসিয়াও যখন কোন আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না, তখন ভাবিলাম, আমার সেই দিনের পরিভ্রমণ বিফল হইল। আনন্দ না আসিলে শরীরে শক্তি জন্মায় না এবং কর্ম্মের প্রতি আগ্রহ আসে না। যখন প্রকৃতির রাজত্বে থাকিয়াও কোন আনন্দ পাইলাম না, শক্তির আধারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যখন কোন শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলাম না, তখন মনে বড় ক্ষোভ হইল। ক্ষুণ্ণ মনে যখন আমার অনুভব-শক্তি-শূন্য চিত্ত ও চিন্তা-শক্তি-খর্ববকারী বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকে ধিক্কার দিতেছিলাম, তখন পাহাড়ের প্রতি নয়ন ফিরাইতেই যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে বেশ তৃপ্তি বোধ করিলাম।

দেখিলাম, পাহাড়ের চূড়ার দিকে একটি স্থান বেশ পরিষ্কার। গাছের ঝোপ্-ঝাপ সে খানে একেবারেই নাই। সেই স্থানটিতে বড় বড় পাথরের চাপ ছিল বলিয়া কোনরূপ ঝোপ হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহারই

মধ্যে কেবল একটি মাত্র গাছ দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাছটি সাধারণ গাছপালা হইতে স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্র ভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। স্তূপাকার প্রস্তর-রাশির মধ্যে আপন জীবন রক্ষা করিতে গাছটিকে প্রথম প্রথম নিশ্চয় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে যে কষ্ট সেই গাছ সহ্য করিয়াছিল, অপর কোন গাছ সেরূপ কষ্ট স্বীকার না করায় সে খানে জন্মাইতে পারে নাই। সেই একটি গাছ বহু কষ্টে তথায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল বলিয়াই আজ আমার মত কত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল।

তখন আমার চতুর্দ্দিকের গাছপালার মধ্যে মনুষ্য-সমাজের প্রতিচ্ছবি যেন দেখিতে পাইলাম। চিন্তার ধারা অল্পে অল্পে মনের ক্ষোভ দূর করিল এবং আনন্দ ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিল। পাহাড়ের বিপরীত ভাগে বনময় স্থানের দিকে যখন চাহিয়া দেখিলাম, তখন বোধ হইল, যেন মনুষ্য-সমাজে জনসাধারণ একই ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। বালকদিগের সেই গতানুগতিক-ভাবে বিদ্যালয়ে গমন এবং চিরন্তন প্রথা-অনুসারে শিক্ষালাভ। যুবার সেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা এবং ভোগের প্রতি আসক্তি। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংসারের প্রতি সেই একই ভাবের আকর্ষণ, আকাঙ্ক্ষা এবং

কামনার পরিপোষণ। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই যেন একই ভাবে, একই পথে চলিয়াছে। এই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করায় সামাজিক নর-নারী সাধারণতঃ কেহ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

আবার যেমন বন-মধ্যে কোন কোন গাছ অপেক্ষাকৃত সরস স্থানে জন্মাইয়া অন্যের অপেক্ষা বড় হইয়া গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি সমাজ-মধ্যে কোন কোন লোক আত্ম-চেষ্টায়, অদৃষ্টের সহায়তায় ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সুযোগে অন্যের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বড় হইয়া থাকে। বনের এইরূপ দুই-চারিটি বড় গাছ যেরূপ কাহারও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সমাজের মধ্যেও সেইরূপ দুই-একটি লোক বড় হইলেও তাঁহাদের প্রতি কাহারও চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের কাহাকেও দেখিয়া হীনাবস্থার লোক মনে করে, 'আমি যে ভাবে থাকি, ইনিও সেই ভাবে থাকেন; অর্থোপার্জ্জন ইঁহার উদ্দেশ্য এবং সংসার-প্রতিপালন ও সঞ্চয় কেবল ইঁহার কর্ম্ম। আমাতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, আমি যে খানে সামান্যভাবে আমার অভাব মিটাইয়া লই, ইনি সেই খানে একটু আড়ম্বরের সহিত নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। অভাব ও আকাঙ্ক্ষা সাধারণের যেরূপ তাঁহারও ঠিক সেইরূপ।'

কিন্তু যখন সেই পাহাড়ের উপরের গাছটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম, তখন একজন ত্যাগী, কর্ম্মী, সহিষ্ণু, নিরপেক্ষ, নূতন পথাবলম্বীর অনুরূপ সকল লক্ষণ তন্মধ্যে দেখিতে পাইলাম। প্রস্তরময় স্থানে দাঁড়াইয়া সেই গাছটি যেন অন্য সকল গাছকে বলিতেছিল, "তোমরা যাহা কর, আমি তাহা করি না। তোমরা যাহা চাও, আমি তাহা চাই না। তোমরা যাহাতে আনন্দ পাও, আমি তাহাতে আনন্দ পাই না। তোমরা যাহাতে কষ্ট বোধ কর, আমি তাহাতেই সুখ পাই। গাছ হইয়াও আমি তোমা-সবা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছি।"

গাছের এই দৃষ্টান্তটি হইতে বুঝিলাম যে, গতানুগতিক ভাব ছাড়িয়া নূতন পথে যাইতে হইবে। ত্যাগ ও কর্ম্মের পথে যাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, শত কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও দৃঢ়তার সহিত সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যখন সমাজের ভিতর থাকিয়াও জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইতে পারা যাইবে। নূতন পথে, ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগের পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই দেখিবে তোমার কার্য্য অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। চিত্তোন্নতি-সম্বন্ধে তোমার কার্য্য ও চিন্তার ধারা জনসাধারণের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবে এবং হয়ত কেহ কেহ তোমার আদর্শ গ্রহণ করিবে।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি সেই দিন সেই গাছটির মধ্যে দেখিলাম এবং তাহারই আদর্শের অনুসরণে বিশেষত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

স্বকার্য্য-সাধন

তখন রাত্রি আড়াইটা কি তিনটা হইবে। পূর্ব্ব- ও উত্তর-আকাশে মেঘ ছিল, কিন্তু পশ্চিম দিকে মেঘের চিহ্নমাত্রও ছিল না। পশ্চিম-গগনতলস্থ চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় আকাশের ও মেঘের বড় শোভা হইয়াছিল। আকাশের সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

দেখিতে দেখিতে মেঘ ছড়াইতে লাগিল। পূর্ব্ব-আকাশ হইতে মেঘ আসিয়া পশ্চিম-আকাশের চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিল। তখন চারি দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটি মেঘের স্তর সরিয়া গেল, পুনরায় চাঁদ দেখা গেল এবং আকাশ ও পৃথিবী আলোকিত হইল। অল্প ক্ষণ পরে চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়িল এবং পুনরায় বাহির হইল। চাঁদের সহিত মেঘের এরূপ খেলা অনেক সময়ে দেখা যায়। কিন্তু সেই রাত্রিতে চাঁদের বিকাশ ও অন্তর্দ্ধান এরূপ নিয়মিতভাবে হইতেছিল যে, ঘটনাটি একটু অসাধারণ বলিয়া বোধ হইল। তখন আমার কন্যাকে নিদ্রা হইতে তুলিলাম এবং দুই জনে জানালায় বসিয়া প্রকৃতির এই মোহন দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

যখন মেঘের ছোট ছোট স্তর চাঁদের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, তখন কালো মেঘের কোলে-কোলে চাঁদের উজ্জ্বল আভা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। কিন্তু যখন কোন বড় মেঘ আসিয়া চাঁদকে একেবারে ঢাকিতেছিল তখনও তাহার পশ্চাতে উজ্জ্বল আলোক থাকায় কালো মেঘ ঈষৎ প্রভাবিশিষ্ট বোধ হইতে-ছিল—যেন একটু ফর্‌সা দেখাইতেছিল।

এক-একখানি মেঘ আসিয়া কিছু ক্ষণের জন্য চাঁদকে ঢাকিয়া রাখিয়া যেমন সরিয়া যাইতেছিল, অমনি চাঁদ নিজের রূপ ও গুণ লইয়া পুনরায় আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেছিল। চাঁদ ও মেঘের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কিছু কাল চলিবার পর মেঘ একটু কাটিয়া গেলে চাঁদ আর মেঘে ঢাকা পড়িল না। চাঁদের আশ-পাশ দিয়া তখনও দুই-একখানি মেঘ যাইতেছিল দেখিয়া আমার কন্যা বলিয়া উঠিল, "মেঘ আর চাঁদকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না।"

কন্যার এই কথায় আমার যেন চমক ভাঙ্গিল। তাহার কথার ভিতর হইতে কে যেন একটি আশার জ্যোতি আমার সম্মুখে ধরিল। আবেগহীন প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্যই যেন কেহ আজ আমায় এরূপ অসময়ে নিদ্রা হইতে তুলিয়া এক অতিসাধারণ দৃশ্য নূতন ভাবে দেখাইল। সেই চিন্তার অনুকূল অবসরে চন্দ্র-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টার জ্যোতি আসিয়া

হৃদয়ে প্রবেশ করিল এবং এক অননুভূত ভাব-তরঙ্গে চিত্ত স্পন্দিত হইল। তখন সেই দৃশ্যের মধ্যে ভগবানের ইঙ্গিত দেখিলাম। বুঝিলাম, যদি কেহ সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে পারে এবং আপন উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য ধৈর্য্য ও স্থিরতার সহিত কার্য্য করে, তাহা হইলে শত্রুতা-সাধন করিয়া কেহই কখনও তাহাকে একেবারে নিষ্প্রভ করিতে পারিবে না। বিপক্ষতাচরণ করিয়া কিছু কালের জন্য তাহাকে হীনপ্রভ করিয়া রাখিলেও কালে সে প্রভামণ্ডিত হইয়া এরূপভাবে দাঁড়াইবে যে, কেহ তাহার বিরুদ্ধে যাইতে বা তাহার কর্ত্তব্য-পথে বিঘ্ন হইতে সাহস পর্য্যন্ত করিবে না। বরং চাঁদের আভা যেরূপ কালো মেঘকেও আভা-বিশিষ্ট করিতেছিল, সেইরূপ ঐকান্তিক, একনিষ্ঠ চেষ্টার আদর্শ অন্যের চিত্তে উৎসাহ সঞ্চার করিবে এবং উদ্যমহীন লোকদিগকেও সজীব করিয়া তুলিবে।

মনের সৌন্দয্য

পিঁজ্‌রার ভিতর পোষা ময়ূর অনেকেই দেখিয়াছে এবং সেই অবস্থায় তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। ময়ূর দেখিলেই মনে হয়, এমন সৌন্দর্য্য বুঝি পৃথিবীর আর কোন জিনিষে নাই;—ভগবান্ বোধ হয় এত সুন্দর করিয়া আর কোন জীবকে সৃষ্টি করেন নাই। পিঁজ্‌রার ভিতর রাখা ময়ূরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বনের মধ্যে বিচরণশীল ময়ূরের সৌন্দর্য্য অনেক বেশী। শোভার জন্য ফুলদানীতে রক্ষিত ফুলের বাহার যেমন পাতায় ঘেরা ফোটা ফুলের বাহারের অপেক্ষা অনেক কম, তেমনি স্বাধীন মুক্ত জীবের বাহারের অপেক্ষা পরাধীন পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের বাহার অনেক কম। হাজারিবাগ সহর হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একদিন একটি বনের ময়ূর দেখিয়াছিলাম।

ময়ূরের রং কি রকম কেহ বলিতে পারে কি? কেহ বলিবে তাহার গলার রং গাঢ় নীল, পিঠের রং সবুজের আভাবিশিষ্ট নীল এবং পুচ্ছ নীলাভ হরিৎ বর্ণ। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, ময়ূরের শরীরের কোন স্থানেই কোন একটি বিশেষ রং নাই। যে অবস্থায় দেখা যায় সেই অবস্থার

উপরে তাহার রং নির্ভর করে। যেমন সূর্য্যের কিরণ ও জলের গভীরতার উপরে জলের রং নির্ভর করে, তেমনি ময়ূরের শরীর হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ এবং তুমি যে স্থান হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ সেই স্থানের দূরত্বের উপরে তাহার রং নির্ভর করে। খোলা জায়গায় রৌদ্রের মধ্যে ময়ূর যখন ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায় তখন তাহার রংএর পরিবর্ত্তন বেশ দেখা যায়। ময়ূরের সৌন্দর্য্য এবং তাহার রংএর পরিবর্ত্তন দেখিলে মানুষের মনের সহিত ইহার সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারা যায়।

ময়ূরের সবই সুন্দর। ময়ূর যখন প্যাখম ধরিয়া নাচে বা ডানা ছড়াইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যায়, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না। তাহার সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে পা দু'খানি যেমন অসুন্দর, মানুষের মনের শত সৌন্দর্য্যের মধ্যেও ভোগ-প্রবৃত্তি ঠিক তেমনি অসুন্দর। স্থানভেদে ময়ূরের সৌন্দর্য্য যেমন কম-বেশী হয়, অবস্থা ও কর্ম্মের ভেদে মানুষের মনের সৌন্দর্য্যও তেমনি কম-বেশী হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ, স্বার্থশূন্য কার্য্য, পরোপকার ও সৎ গ্রন্থ পাঠে মানুষের মনের উন্নতি হয়, তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাহাতে ভোগ-প্রবৃত্তি-রূপ অসৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় না। সুযোগ পাইলেই বা প্রবৃত্তিমূলক ঘটনা সম্মুখে ঘটিলেই মনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তখন ভোগের জন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়, উন্মুখ হয়।

মানুষের ভিতর যত পাপ-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহাদের মূল কারণ এই ভোগ-স্পৃহা। ভোগ-স্পৃহা যাহার যত অধিক, চিত্ত-মধ্যে পশুভাব তাহার তত প্রবল। উড়িবার সময়ে ময়ূর যেরূপ তাহার অসুন্দর পা দু'খানি আপন শরীরের মধ্যে গুটাইয়া লয়, মনের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে হইলে মানুষকেও সেইরূপ আপন ভোগ-প্রবৃত্তি দমন করিতে হইবে। শূন্য-মার্গে উড়িবার সময়ে কোথাও পা রাখিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া যেরূপ ময়ূরের পা আপনা হইতে গুটাইয়া আসে, সেইরূপ সৎ চিন্তা ও সৎ কার্য্যে সকল সময়ে নিযুক্ত থাকিলে আহার-বিহারের প্রতি মনঃসংযোগ করিবার বিশেষ সময় থাকে না এবং সেই জন্য ভোগ-প্রবৃত্তি আপনা হইতেই কমিয়া যায়। মুক্তপক্ষ ময়ূরের সৌন্দর্য্য যেরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনায়ত্ত চিত্তই সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া থাকে। ভোগাকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিতে পারিলেই চিত্তের উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের সৌন্দর্য্য বাড়িতে থাকে।

অভিসম্পাত ও করুণা

শত উপদেশ বা সাধুসঙ্গে মনের যে পরিবর্ত্তন না হয়, একটি আকস্মিক ঘটনায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-সম্বন্ধে কোন প্রকৃত ধারণা নানা আলোচনা, তর্ক বা উপদেশের ফলেও মনে স্থায়ি-ভাবে জন্মায় না, কিন্তু হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটিলে ঐ সকল জটিল বিষয়ের অতিস্পষ্ট মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া যায়। তখন পাপ-পুণ্য বা দুষ্কৃতি ও সুকৃতির ফলাফল-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর থাকে না। এইরূপ কোন একটি সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রকৃতিদেবী একদিন অতিভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

১৩৩২ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ ভোর চারিটা চুয়ান্ন মিনিটের সময়ে চুঁচুড়া সহরের পশ্চিম-প্রান্তভাগ দিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য এক ঘূর্ণিবায়ু বহিয়া যায়। তখন অধিকাংশ লোকই নিদ্রিত ছিল। যাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল তাহারাও অনেকে তখন শয্যা হইতে উঠে নাই।

হঠাৎ চতুর্দ্দিক্ যেন লাল হইয়া উঠিল। লাল রংএর কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে দিলে প্রতিফলিত রশ্মি যে যে

স্থানে পড়ে, সেই সেই স্থানে যেরূপ লালের একটি আভা দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা সূর্য্যাস্তের পর সিঁদুরে-মেঘ উঠিলে যেরূপ ভূপৃষ্ঠের সকল জিনিষই প্রভাবিশিষ্ট দেখায়, সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে, বিনা-মেঘে চতুর্দ্দিক সেইরূপ আলোকমণ্ডিত দেখাইল। কয়েক মিনিট পরেই সকলে একটি ভীষণ শব্দ শুনিল। বজ্রের শব্দের মত বা বোমার শব্দের মত তাহা ক্ষণস্থায়ী নহে,—সে শব্দ সাগর-গর্জ্জনের মত বিরামশূন্য—দীর্ঘকালব্যাপী। সেই শব্দ অনেকেই শুনিল। কিসের শব্দ হইল বা কোথা হইতে সেই শব্দ উত্থিত হইল ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই তাহারা দেখিল যে, কাহারও ঘরের চাল উড়িয়া গেল, কাহারও ঘরের দেওয়াল যেমন ছিল তেমনি রহিল অথচ নূতন চাল আড়া-সমেত উপ্‌ড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে গিয়া পড়িল, আবার কাহারও ঘরের টাটের দেওয়াল এবং খড়ের চাল এমন ভাবে উড়িয়া গেল যে, ঘরের পোঁতাটুকু মাত্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। কাহারও-বা উঠানে দূরস্থিত আম-বাগান হইতে মোটা মোটা আমের ডাল উড়িয়া আসিল। এইরূপ উড়িয়া-পড়া গাছের আঘাতে কত গরু-বাছুর জখম হইল, ঘর-চাপা পড়িয়া কত লোক ভীষণ আঘাত পাইল। আবার পাকা বাড়ী চাপা পড়িয়া দুই-একটি লোক প্রাণ হারাইল; ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন একটি গ্রামে দুইটি

ধানের মরাই ভাঙ্গিয়া গিয়া চারি দিকে ধান ছড়াইয়া পড়িল।

এই ঘূর্ণিবায়ুতে কত লোকের কত অনিষ্ট হইল! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হয়ত কোন স্থানে এক জনের ঘর ভাঙ্গিয়া চাল উড়িয়া গিয়াছিল, অথচ ঠিক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থের কোন ক্ষতিই হয় নাই। এই বায়ুস্রোত অনতিপ্রশস্ত একটি স্থান জুড়িয়া এমন ভাবে বহিয়া গিয়াছিল যে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি রেখা টানিতে পারা যাইত। এই রেখাদ্বয়ের বাহিরে শান্ত বায়ুস্তর, কিন্তু ভিতরে প্রচণ্ড ঝটিকা। এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া লোকে একটু বিস্মিত, একটু ত্রস্ত হইয়াছিল; জানি না সে বিস্ময়, সে ত্রাস তাহাদের চিত্তে কত দিন ছিল।

প্রকৃতির এই বীভৎস রূপের মধ্যে ভগবানের একটি ইঙ্গিত দেখিয়াছিলাম।—যেন তিনি তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার অভয়া মূর্ত্তি এবং সংহারিণী শক্তি জনসাধারণকে একত্র দেখাইয়া দিলেন। তিনি যেন দেখাইলেন, তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহাকেই রক্ষা ও পালন করিবেন এবং কাহাকেও করুণার অপাত্র মনে করিলে এক নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করিবেন। এই সামান্য তাড়নার দ্বারা তিনি আমাদিগকে সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভগবানের তাড়না যে কিরূপ ভীষণ এবং তাঁহার দয়া যে কত মধুর তাহা দেখাইবার জন্যই যেন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণিবায়ু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য প্রবাহিত হইয়া গেল। মঙ্গলময় ভগবানের বিধানে সেই বায়ুস্রোত সহরের মধ্যে লোকের বসতির উপর দিয়া বহিয়া না গিয়া এক প্রান্তভাগ দিয়া চলিয়া গেল। তাহাতেও কতকগুলি লোকের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ক্ষতি না হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইত না বলিয়াই কতিপয় লোককে সেই প্রচণ্ড ঝটিকায় বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

বনময় স্থানে বা সমুদ্রের উপর এইরূপ কত ঘূর্ণিবায়ু বহে, কিন্তু কেহ তাহার কোন সংবাদ রাখে কি? ভগবানের ধ্বংস-বিধায়িনী এবং শান্তি-প্রদায়িনী শক্তি লোকে অনুভব করিতে পারিবে বলিয়াই সেই প্রবল বায়ুস্রোত লোকালয়ের এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে তখন যাহারা ছিল বা ঝড়ের অব্যবহিত পরে সে স্থলে গিয়া যাহারা সেই দৃশ্য দেখিল, তাহারা সকলেই ভগবানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইল। সেই জন্য ভগবানের করুণা-লাভের নিমিত্ত তখন তাহাদের অনেকেরই প্রাণে একটু আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

ঝড়ে যাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই নীচ জাতীয় লোক। তাহাদের শিক্ষা-

দীক্ষা কিছুই ছিল না। ভাল-মন্দের পার্থক্য-সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। কি করিলে ভগবান্ তুষ্ট হয়েন এবং কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী, তাহা তাহারা জানিত না এবং জানিবার চেষ্টাও কখন করে নাই। কিন্তু সেই ঝড়ের প্রাবল্যে শঙ্কিত হইয়া যখন তাহারা ভগবান্‌কে ডাকিতে চাহিল, যখন তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য অনেকের চিত্তে আগ্রহ জন্মিল, তখন কেহই তাহাদের সৎ শিক্ষা দিল না বা ভক্তির সহিত ভগবানের আরাধনার পথ দেখাইল না। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেহই তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিল না। সেই বিপদের দিনে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কেহই তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইল না। কেহ তাহাদিগকে বলিল না যে, যে কোনও ভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিলে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিলে এবং সাধু ও মহাপুরুষের উপদেশ পালন করিলে, নিশ্চয় সকলে তাঁহার করুণা পাইবে। নীচ জাতীয় লোক বলিয়া তাহাদের নিকটে কেহই গেল না। সুতরাং বিপদের পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ সমাজের বাহিরে ছিল, বিপদের পরেও ঠিক সেই অবস্থায় রহিল।

মানব-প্রীতির অভাবে সমাজের ভিতর উচ্চ ও নীচ জাতির মধ্যে এরূপ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে যে, এক জন

অন্যের বিপদে আপনাকে বিপন্ন মনে করে না, আর্ত্তের সেবার জন্য প্রস্তুত হয় না, এমন কি মৌখিক সহানুভূতি পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে না। এই প্রভেদবশতঃ শিক্ষিত বা উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোকই সে দিন তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। সুতরাং ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিবার কোন সুযোগই সেই বিপন্ন অশিক্ষিতেরা পাইল না। প্রকৃতির রাজ্যে এক দিকে গরল ও অন্য দিকে অমৃত নিরন্তর যে ভাবে বর্ষিত হইতেছে তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল না। তাহারা বুঝিল না যে, জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেই ভগবানের করুণার অধিকারী ; তাহারা জানিল না যে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ই সুখের মূল এবং ধর্ম্ম ও নীতিমূলক জীবন-যাপনই সুখের সোপান।

অরণ্য ও লোকালয়

বন যত গভীরই হউক না কেন তাহার মধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ করিয়া একটু বেড়াইলেই দুই-একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে নির্জ্জন বনভূমি লোকালয়ের দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। নিবিড় বনস্থলীতে মানুষের বসতি দেখিলে মনে হয়—সহর, গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে এত জায়গা থাকিতেও ইহারা বনে বাস করিতে আসে কেন ? বন কি ইহাদের এতই প্রিয় !

বন কোন কোন শ্রেণীর লোকের নিকটে বাসের পক্ষে বড়ই ভাল। মনুষ্য-সমাজ-মধ্যে, বহু প্রতিবেশীর ভিতর এইরূপ লোক কখনও বাস করিতে চাহে না। তুমি-আমি গ্রাম বা সহরে বাস করি বলিয়া বনকে ভয় করি। সাপ, বাঘ, চোর, ডাকাত প্রভৃতি নানা বাস্তব পদার্থ ও ভূত, প্রেত প্রভৃতি অনেক কাল্পনিক বস্তুর কথা ভাবিয়া আমরা নিজের নিজের মন সমাজোপযোগী করিয়া তুলিয়াছি। সমাজে বাস করিতে গেলে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা বা অন্যের কুটিলতার প্রতীকার কি ভাবে করিতে হয়, এই শিক্ষা আমরা বালক-কাল হইতে নানা ভাবে পাইয়া থাকি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

অনেক চেষ্টা করিয়া এই সকল জ্ঞান অর্জ্জন করি। এক অন্যায়ের প্রতীকার অপর এক অন্যায়ের দ্বারা কিরূপে সাধিত হয় তাহা আমরা জানি এবং এক জনকে বঞ্চিত করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কিরূপে হস্তান্তরিত করিতে হয় তাহাও আমরা বুঝি। পরদ্রব্যের প্রতি লোভ এবং পরস্ব গ্রহণ বা অপহরণের প্রবৃত্তি—যাহাকে সভ্য জগতে বলে বিষয়-বুদ্ধি—তাহা যাহার যত বেশী সে ততই বড় সামাজিক। এই প্রকৃতির লোক উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র প্রতিবেশী ও বিপক্ষ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাস করিতে ভালবাসে।

একজন সাঁওতাল, কোল বা ভীলের সেরূপ কোন শিক্ষা নাই বলিয়া সে বন্য জন্তু অপেক্ষা মানুষকে বেশী ভয় করে। সে জানে যে, আক্রমণ না করিলে বন্য জন্তু প্রায় আক্রমণ করে না, আর যাহারা অকারণ আক্রমণ করে তাহাদেরও ক্রোধ বা হিংসার একটা সময় আছে। সুতরাং চেষ্টা করিলে বন্য জন্তুর দ্বারা সাধিত অনিষ্টের প্রতিবিধান মানুষে করিতে পারে। কিন্তু মানুষের হস্তে মানুষের নির্য্যাতনের কোন আইন-কানুন নাই, সময়-অসময় নাই, কারণ-অকারণ নাই, পাত্রাপাত্র-ভেদও নাই। সভ্য লোকের সংস্পর্শে আসিয়া অসভ্য সাঁওতাল এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহারা এখনও সভ্য মানুষ অপেক্ষা সাপ-বাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তুকে কম ভয় করে।

সমাজ এমনি স্থান যে, কেহ তোমাকে তথায় আপন ইচ্ছামত বাস করিতে দেয় না। নির্ব্বিবাদে প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করা অসম্ভব বলিলেই হয়। তুমি তোমার কুটির-পার্শ্বে দু'টি শাক-পাতা লাগাইয়া সংসার প্রতি-পালন করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে—ছাগল্-গরু ছাড়িয়া দিয়া আমি তোমার গাছপালা খাওয়াইয়া দিব। তাহাতে তুমি যদি কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা কর, তাহা হইলে প্রবল-প্রতাপ আমি তোমার অহঙ্কার, তোমার তেজ খর্ব্ব করিবার জন্য তোমার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিব এবং যেরূপেই হউক তোমাকে বিপন্ন করিব। তখন আত্ম-রক্ষার জন্য তুমি অন্যায় করিতে আরম্ভ করিবে, মিথ্যা বলিবে এবং হয়ত জাল-জুয়াচুরিও করিবে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তোমাকে সরল-ভাবে তাহার মধ্যে বাস করিতে দিবে না, কেবল সৎ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে দিবে না। সমাজে বাস করিলে তোমাকে বাধ্য হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও ভোগপ্রিয় হইতে হইবে।

যাহারা বনে বাস করে, তাহারা সাপ-বাঘ হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। সাপ-বাঘ প্রতাপান্বিত হইলেও সকল সময়ে লোকের অনিষ্ট করে না বলিয়া শত্রুর মাঝে বসবাস করা সত্ত্বেও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি অরণ্যবাসীর চিত্তে সদাই জাগে না,

বরং ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর নির্ভরতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। *সরল-প্রকৃতি সাঁওতালেরা লোকালয় ও* অরণ্যের মধ্যে এই পার্থক্য বুঝিতে পারে বলিয়াই তাহারা বন ছাড়িয়া গ্রাম বা সহরের মধ্যে বাস করিতে আসে না। সেই জন্য "অমুক স্থানে গিয়া বাস কর না কেন?"— এইরূপ প্রশ্ন কোন সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করায় সে যখন বলিয়াছিল, "কি করিয়া যাইব, ও-খানে যে মানুষ বাস করে," তখন তাহার কথা শুনিয়া প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। সেই সাঁওতালের নিকট হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া অবধি যতই মানুষ দেখিতেছি ততই তাহার নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা নজরে পড়িতেছে। মানুষের হাতে নির্য্যাতিত হইলে মনে হয় না কি যে, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও শান্তিতে বাস করিতে হইলে লোকালয় অপেক্ষা অরণ্য অনেক ভাল?

মৃত্যু-জয়

এমন কোন জীব বা কোন জিনিষ দেখা যায় না যাহার মৃত্যু নাই। মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ আজ আছে, কিন্তু দুই দিন পরে আর থাকে না। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ আজ দেখিতেছ, কিন্তু দশ-পনের বা বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে আর দেখিবে না; মৃত্যু হওয়ায় তাহারা এ জগৎ হইতে চলিয়া যায়। মানুষও চিরস্থায়ী নহে। কত লোক আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গিয়াছে; কত আসিয়াছে, আবার চলিয়া যাইবে। অনেক বড় বড় গাছ দেখিলে মনে হয় যেন তাহাদের মৃত্যু নাই; কিন্তু তাহাদেরও মৃত্যু আছে। কয়েক শত বৎসর পরে তাহাদেরও অস্তিত্ব পৃথিবীর উপর থাকে না। মৃত্যু অনিবার্য্য—হয় আজ না হয় কাল সে আসিবেই। কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না।

আমাদের জীবন-সম্বন্ধে এমন সত্য আর নাই। জীবনে কে বড় হইতে পারিবে, কে লেখা-পড়া করিয়া উচ্চ-শিক্ষিত হইবে, কাহারই বা জ্ঞানী, পণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কেহই পূর্ব্ব হইতে নিশ্চিত বলিতে পারে না। তবে প্রত্যেকের সম্বন্ধে ইহা নিশ্চয় করিয়া

বলা যায় যে, তাহার মৃত্যু একদিন না একদিন হইবেই।

মৃত্যু যখন আমাদের ভাগ্যে ঘটিবেই তখন আমরা সময় থাকিতে তাহার প্রতীকার করি না কেন? 'মৃত্যুর প্রতীকার' কথাটা শুনিয়া তোমরা হয়ত হাসিবে। কিন্তু বোধ হয় মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। যে উপায়ে মৃত্যুর মৃত্যু-সাধন করিতে পারা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। পাছে মৃত্যু আসে, এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণটিকে জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই মৃত্যুর প্রতীকার হয় না। মৃত্যুর প্রতীকার হয়—কর্ম্মে, উৎসাহে, সাহসে।

পরিশ্রমে দেহ নষ্ট হইবার ভয়ে কোন কাজ আরম্ভ না করিলে বা কাজ আরম্ভ করিয়া অত্যধিক শ্রমে শরীর ক্ষয় হইবে ভাবিয়া কার্য্য ত্যাগ করিলে মৃত্যুকে জয় করা যায় না। মৃত্যুভয় অপেক্ষা কর্ম্মকে যদি বড় করিয়া দেখিতে পার তাহা হইলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। শরীর নষ্ট হয় হউক, পরিশ্রমে দেহ ক্ষয় হয় হউক, তথাপি কর্ম্ম ত্যাগ করিব না মনে করিয়া যে কর্ম্ম করিতে পারে, কিংবা কর্ম্মের আনন্দে ও আবেগে মৃত্যুর চিন্তা পর্য্যন্ত যাহার হৃদয়ে স্থান না পায়,—তাহারই জীবনে মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ম্মের বাহুল্যে দেহের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে

দেখিয়া, বা শ্রমের প্রাবল্যে শরীর ক্ষয় হইতেছে বুঝিয়াও যে ভীত না হয়, কিংবা মৃত্যুর বিভীষিকা যাহার হৃদয় হইতে কর্ম্মজনিত আনন্দ বিলোপ করিতে না পারে,—তাহারই নিকট মৃত্যুর পরাজয়। মৃত্যু তাহার দেহ লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লইয়া যাইতে পারে না। দেহ যত ক্ষণ থাকে তত ক্ষণ দেহেরই পূজা হয়, কিন্তু দেহ মৃত্যুর আয়ত্ত হইলে সেই প্রাণহীন দেহের পূজা না করিয়া অনন্ত কালের জন্য কর্ম্মীর প্রাণ ও কর্ম্মকে লোকে পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিলোপ হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের বিনাশ হয় না বা তাহার পূজা কোন দিন বন্ধ থাকে না। মৃত্যুতে যখন কাহারও সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, যখন বিস্মৃতি আসিয়া অচিরে সব অন্ধকার করিয়া দেয়, তখন মৃত্যু তাহার দেহ ও জীবন দুই-ই জয় করে। কিন্তু যখন মৃত্যুতে কাহারও সামান্য দেহটুকুর বিনাশ হয়, অথচ তাঁহার স্মৃতি ও কর্ম্ম অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন তাঁহার জীবন মৃত্যুকেই জয় করে—মৃত্যুর মৃত্যু তাঁহার দ্বারাই সাধিত হয়।

স্বার্থ-প্রণোদিত কর্ম্মে মৃত্যুর মৃত্যু সাধিত হয় না। এই যে এত লোক সকল সময়ে কাজ করিতেছে,—কত অর্থ, কত সম্মান অর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু কয়

জন তাহাদের মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে? মৃত্যুকে জয় করিতে হইলে নিঃস্বার্থভাবে দশের ও দেশের কল্যাণে ও মুক্তির জন্য কাজ করিতে হইবে— তা সে মুক্তি পাপের বা মোহের গ্রন্থি হইতেই হউক, বা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির বন্ধন হইতেই হউক, কিংবা অধীনতা অথবা দাসত্বের শৃঙ্খল হইতেই হউক। ভগবানের প্রদত্ত শক্তি যদি কেহ জগতের ও জীবের কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, স্বার্থ-সিদ্ধির পরিবর্ত্তে পরের হিতে যদি কেহ নিজের শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, স্বীয় কর্ম্মফলে অন্যের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া যদি কেহ শত কষ্টেও সুখ অনুভব করিতে পারে, আর ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া আপন প্রাণমন কর্ম্মে অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে

"জীবনে মরণ করিয়া দলন,
চলিবে অনন্ত-পথে।"

বটগাছ ও স্থায়িত্ব

উলা গ্রামটি এক সময়ে খুব বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। সে খানে অনেক উচ্চবংশীয় সদ্‌ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাজা বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্ঞাতিগণই সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও সাহায্যে গ্রামে মহাসমারোহে বারইয়ারী তলায় দুর্গোৎসব, নাচ-গান, রঙ্গ-তামাসা ইত্যাদি হইত। তাহা ছাড়া বহু গৃহস্থ-পরিবারেও নানা দেবদেবীর পূজা হইত। উলার ব্রাহ্মণ-বংশের ও কৌলীন্যের খ্যাতির কথা প্রবাদরূপে আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদটি এই—

"উলার মেয়ের কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত-নাড়া, আর গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

উলার এখন আর সমৃদ্ধি কিছুই নাই। একটু একটু করিয়া অবনতি ঘটিয়া আজকাল ইহা একটি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। উলায় এখন আর সে অতিথি-সৎকার নাই। পূর্ব্বে কোন অপরিচিত লোক তথায় যাইলে তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে হইত না। যে জাতি,

যে বর্ণের লোকই হউক না কেন উলায় পৌঁছিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে দেখিত যে, ঠিক সেই জাতির এবং সেই বর্ণের অধিবাসী আসিয়া তাহাকে সাদরে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেছে। অতিযত্নের সহিত গৃহে লইয়া গিয়া গৃহস্থগণ অতিথির পরিচর্য্যা করিত এবং গ্রাম হইতে অতিথি অনাহারে ফিরিয়া গেলে বা রন্ধন করিয়া আহারাদি করিল শুনিলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিত।

সেই উলার অবনতি ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবার জন্য একবার তথায় গিয়াছিলাম। গ্রামে যাইতে হইলে এখন যে ষ্টেশনে নামিতে হয়, তাহার নাম বীরনগর।

গ্রামের পথে যাইতে যাইতে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাই। গাছের তলাটি বেশ পরিষ্কার দেখিয়া তথায় উপবেশন করি। চারি দিকে বন-জঙ্গল থাকা সত্ত্বেও গাছতলাটি বেশ পরিষ্কার থাকিবার বিশেষ কারণ এই যে, গাছে ঘন ডালপালা ও পাতা থাকার জন্য রৌদ্র একেবারে মাটিতে পড়িত না এবং সেই জন্যই কোনও আগাছা তাহার নিম্নে জন্মিতে পারিত না। গাছটি বহু কালের বলিয়া বোধ হইল। তখন মনে হইল, আজ আমি যেরূপ বিশ্রাম করিবার জন্য এই গাছতলায় বসিয়াছি, পূর্ব্বে পূজা-পার্ব্বণের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম

হইতে সমাগত কত যাত্রী এইরূপে এ স্থানে বিশ্রাম করিত। পূর্ব্বের সমৃদ্ধির কথা ভাবিয়া বটগাছের ক্ষোভ হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বড় ক্ষোভ হইল এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রামে প্রবেশ করিলাম।

গ্রাম-মধ্যে বারইয়ারীর আটচালা ও পূজামণ্ডপ দেখিলাম, ঠাকুরের কাটামো দেখিলাম, বলিদানের হাড়ি-কাঠ দেখিলাম, আর দেখিলাম গ্রামের চতুর্দ্দিকে ফলের ও ফুলের বাগান এবং ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা। ফুলের বাগানে প্রায়ই কোন গাছ নাই, কিন্তু এখনও কেয়ারি-করা পথ, বসিবার বাঁধানো বেদী এবং চীনা-মাটির ফুলগাছের টব কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল। দুই-একটি বাগানে কামিনী, বকুল, চাঁপা প্রভৃতি বড় বড় ফুলগাছ এখনও আছে। অনেক বাড়ী দেখিলাম,—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গৃহস্থের বাসোপযোগী ছোট, কিন্তু অধিকাংশই বড়, অট্টালিকা-বিশেষ। রাজা বামন-দাসের বাড়ী প্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহৎ—একটি ছোট নগর বলিলেই হয়। এত বাড়ী দেখিলাম, কিন্তু গ্রামে লোকজন বিশেষ নজরে পড়িল না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, অধিকাংশ বাড়ীই খালি পড়িয়া রহিয়াছে। যাহাতে কেহ বাস করে তাহাতেও মাত্র একটি-দুইটি প্রাণী আছে, বাকি সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বা দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছে।

গ্রামের অবনতি দেখিয়া দুঃখ হইল। গ্রামের লোক-সংখ্যা কেন এত কমিল এবং গ্রামবাসীর এরূপ অবনতি কেন হইল ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে পুনরায় সেই বটবৃক্ষতলে আসিয়া বসিলাম।

এ বার বটবৃক্ষ যেন নূতন রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন আমার বেশ লক্ষ্য হইল যে, এক শাখা হইতে গুটি কয়েক করিয়া ঝুরি নামিয়া মাটিতে পৌঁছিয়া এক-একটি বৃক্ষ-কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে এক বৃক্ষ শত বৃক্ষে পরিবর্দ্ধিত হইয়া চরম উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বটবৃক্ষের উন্নতি- এবং গ্রামবাসীর অবনতি-সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিতেছিলাম তখন বৃক্ষ যেন এক নূতন শিক্ষা দিল। সেই শিক্ষা প্রকৃত কিনা, সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য পুনরায় গ্রাম-মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, অধিকাংশ বাড়ীই বাস্তু-ভিটার উপর নির্ম্মিত এবং প্রায় সকল ভিটাতেই পাঁচ-সাত পুরুষ ধরিয়া লোক বাস করিয়াছে। এক স্থানে বা এক বাড়ীতে বহু কাল ধরিয়া বাস করিলে অধিবাসীর স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে কি? বোধ হয়, পারে না। শুধু স্বাস্থ্য কেন, চিত্তও জড়তাপন্ন—স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া আসে। স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকূল আচরণ করিলেই অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ইঙ্গিত

প্রকৃতির রাজ্যে যখন দেখা যায় যে, কোন জীব প্রতি-বৎসর একই গৃহে বাস করে না এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করায় তাহাদের স্বাস্থ্য কখনও ভগ্ন হয় না, তখন বংশপরম্পরানুক্রমে বহু কাল ধরিয়া একই গৃহে বাস করিয়া মানুষ কি করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে? বট-গাছ নূতন নূতন স্থানে ঝুরি নামাইয়া নূতন বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই তাহার গৌরব শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মানুষও যদি দুই-তিন পুরুষ এক স্থানে বাস করিয়া বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া সেই গ্রামেরই অন্য স্থানে আবার বসতি আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি নাও হইতে পারে। কলা, বাঁশ প্রভৃতি যে সকল গাছ ঝাড়-বাঁধিয়া একই স্থানে বহু কাল ধরিয়া থাকে তাহারাও যেরূপ অল্প অল্প সরিয়া আদি স্থান ত্যাগ করে, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে মানুষেরও সেইরূপ সময়ে সময়ে বাসস্থান ত্যাগ করা উচিত।

সাধারণতঃ বড় বাড়ী, বড় ঘরের বংশ-নাশ ও লোক-সংখ্যার হ্রাস যত বেশী দেখা যায়, ছোট বাড়ীর, গৃহস্থ ঘরের তত বেশী দেখা যায় না। বাস্তু-ভিটায় বড় বাড়ী করিয়া বংশানুক্রমে বহু কাল ধরিয়া বাস করা অস্বাস্থ্য-কর। বটগাছ আমায় এই শিক্ষা দিয়াছে; জানি না, সে শিক্ষায় কোন সত্য নিহিত আছে কিনা।

রাজপথ

সমাজ বলিলে শুধু কতকগুলি লোক-সমষ্টি বুঝায় না। লোকের নিত্য কার্য্যের এবং নৈমিত্তিক ব্যবহারের এমন কতকগুলি নিয়ম ও আচার আছে যাহা পালন করিয়া বাস করিলেই সমাজে বাস করা হয়। এই আচার-পালনই সমাজের বন্ধন। যদি কতকগুলি লোক একত্র বাস করিয়াও আচার-পালন এবং নিয়ম-রক্ষা না করে তাহা হইলে সেই জনসঙ্ঘকে সমাজ বলা যায় না। কলিকাতায় কোন সমাজ নাই। তাহারই অনুকরণে আজকাল অনেক সহরে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে।

বন্ধনহীন সমাজ যেন একটি পিচ্-ঢালা বা সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ। এইরূপ পথে যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেইরূপে চলিতে পারে। কেহ জোরে, কেহ আস্তে, কেহ অবাধে দৌড়িতে পারে, কেহ-বা অসঙ্কোচে বসিয়া থাকিতে পারে। আবার কেহ ইচ্ছা করিলে পিছন হাঁটিয়া যাইতে পারে—হুচট্ খাইবার বা গর্ত্তে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এরূপ রাজপথে এমন অনেক লোক দেখা যায়,

যাহারা চলে, কিন্তু কোন গন্তব্য স্থির থাকে না, বা চলিবার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত থাকে না। চলিতে হয়, তাই তাহারা সেই পরিষ্কার পথে চলে।

রাজপথে মানুষ যে ভাবে চলে বন্ধনহীন সমাজেও লোকে ঠিক সেই ভাবে চলে। সে খানেও কোন বাধা নাই, কোন দায়িত্ব নাই, আপনার ভিন্ন পরের চিন্তা নাই। সম্মুখের পথ পরিষ্কার দেখিলেই তাহারা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। যেন অগ্রসর হইয়া যাওয়াটাই তাহাদের কাজ, তাহাতে কোন উদ্দেশ্য থাক বা না থাক,—ভবিষ্য-সঙ্কল্পিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাক বা না থাক। আপন অনুষ্ঠিত কর্ম্মে নিজের কি ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে তাহার আলোচনা নাই, সমাজের কি উপকার হইবে তাহার বিচার নাই, দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে কিনা সে চিন্তাও নাই। চিন্তা আছে মাত্র—অগ্রসর হইবার জন্য। সেই জন্য দেখি, অধিকাংশ লোককেই অর্থের পথে অগ্রসর হইতে, অপেক্ষাকৃত কম লোককে অর্থকরী বিদ্যার পথে যাইতে, আরও কম লোককে জ্ঞান বা নিঃস্বার্থ কর্ম্মের পথে চলিতে এবং তদপেক্ষা কম লোককে ভক্তি বা ধর্ম্মের পথে যাইতে। অগ্রসর হইয়া যাওয়া যেন তাহাদের একটি নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ফলে কোথায় যাইবে বা পরে কি করিবে কেহ জানে না, কেহ ভাবিতেও চাহে না।

রাজপথগামী যেরূপ সম্মুখে পথ ফাঁকা পাইলেই সোজা হউক বা না হউক সেই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট থাকে, বন্ধনহীন সমাজেও সেইরূপ অর্থকামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই অগ্রগামী হইয়া আছে। যাহার সম্মুখে যে কার্য্য আসিতেছে সে সেই কার্য্যই লইতেছে; অর্থের পথে, অর্থ-সুলভ কর্ম্মের পথে—যে যেখানে যে ছিদ্রটি দেখিতেছে তাহাতেই প্রবেশ করিতেছে। আপন সামর্থ্য-অসামর্থ্য, আসক্তি-অনাসক্তি, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বা সেই কার্য্যের সুফল-কুফল-সম্বন্ধে কোন বিচার নাই, আলোচনা নাই। সেই জন্যই দেখি, নীচ জাতির কার্য্য উচ্চ জাতি করিতেছে এবং উচ্চ জাতির কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য নীচ জাতি প্রস্তুত হইতেছে; সৎ অসতের কার্য্য করিতেছে এবং অসৎ সতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে। ভূত-ভবিষ্যতের সহিত কাহারও যেন কোন সম্বন্ধ নাই, কোন বন্ধন নাই; কেবল বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াই যেন সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য যে যে-দিকে পাইতেছে সেই দিকেই চলিয়াছে।

নানা দিক্ হইতে লোক আসায় যেরূপ রাজপথের স্থানে স্থানে লোকের ভিড় জমিয়া যায়, হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, বন্ধনহীন সমাজেও কর্ম্ম লইয়া লোকের মধ্যে সেইরূপই কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়,

সে খানে একের কার্য্য অন্যে করে। লোকের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দেখিয়া কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। বর্ণ, জাতি, বংশ, আভিজাত্য, শিক্ষা বা অভ্যাসের বিভিন্নতার সহিত কর্ম্মের বিভিন্নতা প্রায়ই দেখা যায় না। সে খানে যেন সবই একাকার। সচল পৃথিবীর সহিত তাহার নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা প্রভৃতি সবই যেরূপ সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে, সেইরূপ অগ্রগামিনী রাজধানীর মধ্যে সকলেই একপথে চলিয়াছে—বিচারের জন্য, আলোচনার জন্য এক বার দাঁড়াইবার অবসর নাই, চেষ্টাও নাই।

আবার, রাজপথে এক জন অগ্রসর হইলে যেরূপ অন্য এক জনের অগ্রসর হওয়া হয় না, যে আগে যায় সে যেমন অন্য কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় না, বা অপর দুই-পাঁচ জন আসিয়া মিলিত হইবে বলিয়া অপেক্ষা করে না, বন্ধনহীন সমাজেও সেইরূপ যখন এক জন বড় হয় তখন সে প্রতিবেশীর কাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে বড় করিবার কোন চেষ্টা করে না; বরং অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, সে অন্যের উন্নতির পথে বাধা দেয়। কেহ ধনী হইলে সে আপন ধনরাশির অতিসামান্য একটি অংশ পর্য্যন্ত শাস্ত্র- এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা, সাহিত্য- এবং বিজ্ঞান-শিক্ষা বা সাধারণ বিদ্যার্থীর ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিতরূপে ব্যয় করিয়া দশের মঙ্গল ও উন্নতি-সাধন করে না। সে

আপন ধন শুধু আপন সুখ ও সুবিধার জন্য ব্যয় করে; সে আপনিই কেবল অগ্রসর হইয়া যায়।

নানা সুবিধা ও প্রলোভন দিয়া রাজপথ—সহরের রাজপথ, দুরাকাঙ্ক্ষার রাজপথ, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির রাজপথ—আমাদের চিত্তে কেবল অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি এবং ঘুরিবার বাসনা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিতেছে,—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে,—স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-শক্তি প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে। সে কেবল বলিতেছে, 'চলিয়া চল, অগ্রসর হও।' কোথায় যাইতেছ, কোথায় যাইবে—কেহ এক বার ভাবিয়া দেখিবে কি ?

সংযমে আনন্দ

কথায় বলে, "আগুন কি কখনও ছাই-চাপা থাকে ?" এই প্রবাদটি আমরা যখন-তখন লোকের মুখে শুনিতে পাই। কেন থাকিবে না ? আমি ত দেখি, আগুন ছাই-চাপাই থাকে। কাঠ, কয়লা, ঘুঁটের মত সাধারণ কোন জিনিষ যখন পোড়ে তখন যে অংশটুকু পোড়ে সেটুকু ছাই হইয়া যায়, জ্বলন্ত অঙ্গার বা স্ফুলিঙ্গ তাহার ভিতরে থাকে। যে অঙ্গারটুকু থাকে তাহাও অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তখন আগুন ছাইএর মধ্যে থাকিয়াই নিবিয়া আসে। ছাইএর ভিতর জ্বলন্ত অঙ্গার থাকিতে থাকিতে যদি তাহাতে কাঠ দেওয়া যায়, তাহা হইলেই আগুন বাহির হইয়া আসে, এবং কাঠ জ্বলিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আগুন ছাই-চাপা রাখা-না-রাখা তোমার হাতে। আগুনের নিজের এমন কোন শক্তি নাই যাহার দ্বারা সে ছাই ভেদ করিয়া নিজেই বাহির হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবাদটি দুর্ব্বলচিত্ত, অসংযমীর মুখেই বেশী শোনা যায় এবং কাহারও অন্যায় ব্যবহার বা

দোষের মাত্রা কমাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোথায় কোথায় আগুন রহিয়াছে তাহা দেখিলে না, মনের কোথায় কি কি আগুন জ্বলিতেছে তাহা আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা অনুসন্ধান করিলে না, অথচ সকল প্রকার আহার-বিহারের মধ্যে রহিলে, তাহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে না কেন? আত্মপরীক্ষার দ্বারা যদি তুমি মনের আগুনের সন্ধান রাখিতে এবং সে আগুন যাহাতে না বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে যত দিন ইচ্ছা আগুন চাপা রাখিতে পারিতে।

আগুন চাপা রাখিতে পারিলে এবং মনের বলে ও উৎসাহে মানসিক উত্তেজনা এবং দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলে, একটি আনন্দ পাওয়া যায়। সেই আনন্দের আস্বাদ যে এক বার পাইয়াছে, ভোগপ্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে যে এক বার নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে, প্রলোভনের স্রোতে নিজেকে না ভাসাইয়া যে এক বার তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সেই আগুন ছাই-চাপা রাখিতে পারে। তবে আগুন বরাবর চাপা রাখিতে হইলে সতর্ক থাকিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে ছাই সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সেই জ্ঞান- ও কর্ম্ম-রূপ ছাই আগুনের উপর চাপা দিতে হইবে। তখন দেহরূপ অনলকুণ্ডে আর মোহ- ও আসক্তি-রূপ অগ্নি জ্বলিবে না। আকাঙ্ক্ষা

দমন করিয়া ও মোহমুক্ত হইয়া তুমি স্বাধীন হইয়া উঠিবে। তখনই তুমি সংযমের আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

অন্তরের এক আগুন নির্ব্বাপিত হইলে অপর এক আগুন জ্বলিয়া উঠে। সে আগুন এক বার জ্বলিলে আর নিবে না। ছাই তাহাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না; তাহা ছাইকেও গলাইয়া-পোড়াইয়া শিখা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। শত বাধাবিঘ্ন-রূপ আবরণ ভেদ করিয়া সে পবিত্র অগ্নি আপন তেজে দীপ্তিমান্ হয়। সে অগ্নি জ্বলিয়াছিল একদিন দেশপূজ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্তে। ভোগ- ও বিলাস-রূপ অগ্নির নির্ব্বাণে স্বদেশ-ভক্তি- ও স্বজাতি-প্রেম-রূপ যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল তাহা কোনরূপেই নির্ব্বাপিত হইল না। জ্বলিতে জ্বলিতে সে অগ্নি দাবানলের মত মানবারণ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত বৃক্ষলতা তাহাতে জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে সেই অনির্ব্বাণ অগ্নি চিত্তরঞ্জনের দেহরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিল। তখন সেই শীতল ভস্মরাশি—তাঁহার সেই প্রাণহীন দেহ—স্পর্শ করিবার বা শুধু এক বার দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক কলিকাতাভিমুখে ছুটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ কাঁদিল।

সংযমে আনন্দ

১৩৩২ সালের ৪ঠা আষাঢ় কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের শবানুগমনের সময়ে যে ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম তাহা পালন করিতে—আত্ম-সংযমে আনন্দ বোধ করিতে, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগে সুখ বোধ করিতে—পারিব কি ?

প্রেমিক ভগবান্

একদিন দেখিলাম, একটি শিশু এক.জনের কোলে থাকিয়া অপর এক জনের দিকে চাহিতেছে, আর খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে। লোকটি যেমন অন্য দিকে চাহিতেছিল, শিশুর হাসি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইতেছিল। আবার যখন লোকটি শিশুর দিকে ফিরিতেছিল, তখনই সে পুনরায় হাসিয়া উঠিতেছিল। শিশুর তৃপ্তি বা আনন্দের জন্য সে লোকটি আদর করে নাই, তুড়ি দেয় নাই, বা তাহার দিকে চাহিয়া কোনরূপ মুখভঙ্গীও করে নাই; তবুও সে যেমন শিশুর প্রতি চাহিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিও হাসিয়া উঠিতেছিল। সে লোকটির চাহনিতে প্রকাশ পাইতেছিল তাহার সরল প্রাণ এবং আবেগ- ও স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি। শিশু তাহার সেই দিনের হাসির দ্বারা ভগবানের প্রেম ও করুণার একটি ছবি দর্শকের হৃদয়ে আঁকিয়া দিল।

শিশুর এত আনন্দ হইতেছিল কেন? লোকটি যখন তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল তখন সেই শিশুর স্বার্থসিদ্ধি হইতেছিল কি? তাহা ত বোধ হয় না; কারণ সে লোকটি তাহাকে আদর করে নাই, হাততালি

বা তুড়ি দেয় নাই; কেবল তাহার দিকে আগ্রহপূর্ণ নয়নে চাহিতেছিল মাত্র। এক বৎসরের অল্পবয়স্ক শিশু না হইয়া যদি সে একটি বালক হইত তাহা হইলে কোন লোককে তাহার দিকে চাহিতে দেখিলে সে হাসিত কি? কিছুতেই নহে; কারণ আনন্দ কি সে সম্বন্ধে বালকেরও একটি ধারণা থাকে এবং আনন্দ কিসে হয় সে তাহাও বুঝিতে পারে। সে জানে যে, ভালবাসার কোন জিনিষ পাইলেই তাহার আনন্দ হয়—তা সে খাবার হউক, খেলনা হউক, কাপড়-জামা হউক বা একটু আদর হউক। কিছু না পাইলে বালক সন্তুষ্ট হয় না, আনন্দ বোধ করে না। স্বার্থ-সিদ্ধিতে আনন্দ হয়—এই ধারণা বালক-কাল হইতেই আমাদের চিত্তে জন্মিয়া থাকে। শিশুর এই ধারণা থাকে না বলিয়াই শিশু বালক হইতে বিভিন্ন; তাহার প্রকৃতি স্বচ্ছ জলের ন্যায় নির্ম্মল, কলঙ্কশূন্য, হিংসা-লোভ-বিরহিত।

মানুষ যত বড় হইতে থাকে ততই সে স্বার্থপর হইয়া উঠে; লাভালাভ বিচার সে ততই বেশী করিতে শিখে। সেই জন্যই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ কমিয়া যায়; হাসি কমিয়া যাওয়ায় তখন তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠে। তখন স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে, স্বার্থসিদ্ধির পথে কেহ অন্তরায় হইলে তাহার

দুঃখের বা ক্রোধের সীমা থাকে না। নিজের স্বার্থ-পূর্ণ না হইয়া যদি অন্যের স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার উপর হিংসা জন্মায়। এইরূপে নানা ভাবে নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ আপন আপন প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সময়ে চেষ্টা করে। সেই জন্য আমাদের আত্মীয় বা আশ্রিত ব্যক্তি কোন উপদেশ না শুনিলে বা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে আমরা সাধারণতঃ রুষ্ট হইয়া থাকি। অন্যের ত্রুটি সহ্য করিবার শক্তি আমাদের যত কমিয়া যায় ততই আমরা ভগবানের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাই।

প্রেমময় ভগবান্ অনন্ত শক্তিশালী হইয়াও কাহারও কোন ত্রুটি গ্রহণ করেন না, বা তজ্জন্য রুষ্ট হয়েন না। ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হইয়াও যদি কেহ অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেও ভগবান্ প্রতিহিংসা-পরায়ণ না হইয়া করুণাবশতঃ তাহাকেই আবার সৎ পথে আনিবার চেষ্টা করেন। শিশুর মত ভগবান্‌ও যেন সকল সময়ে হাসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। তাঁহার দিকে চাহিলেই সে মধুর হাসি দেখিতে পাইবে। ভগবানের হাসি দেখিলে, তাঁহার প্রেম ও করুণা পাইলে তুমি সুখী হও বলিয়াই তিনি সদানন্দময়, প্রেমময়- ও করুণাময়-রূপে তোমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তুমি

এক বার প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাক, তাহা হইলেই তুমি তাঁহার করুণা পাইবে, সেই মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ভগবানের অবারিত করুণার আস্বাদ পাইয়াই 'গীতাঞ্জলি'তে লিখিয়াছেন,—

"তোমায় ডাকি বা নাই ডাকি,
যা খুসি তাই নিয়ে থাকি,—
তোমার খুসি চেয়ে আছে
আমার খুসির আশে॥"

মা, না দাসী

যে মা আপন শরীরের রক্ত দিয়া সন্তানকে পোষণ করেন এবং সুধারূপ দুগ্ধ আপন বক্ষ হইতে ক্ষরণ করিয়া সন্তানকে পালন করেন, সেই মা সন্তান বড় হইলেও তাহার লালন-পালন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন না। সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাহার সুখ ও সুবিধার জন্য মা সকল সময়ে কাজ করিয়া থাকেন। রাঁধিয়া-বাড়িয়া পাঁচ রকম করিয়া সন্তানকে খাওয়াইতে কোন্ মা ভাল না বাসেন? কর্ত্তব্য-বোধে তিনি সে কাজ করেন না,—তাহা করেন সন্তানের প্রতি স্নেহ-বশতঃ।

আজকাল অনেক পুত্র মাতার স্নেহের কথা ভুলিয়া গিয়া সন্তানের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে নানা বিচার করিতেছে। আপন আপন সুখ ও সুবিধার জন্য অনেক কাজ তাঁহারা মাকে দিয়া করাইয়া লইতেছে। বাৎসল্যবশতঃ মা সন্তানের জন্য যাহা করেন তাহার উপর এমন অনেক কাজ তাঁহাকে দিয়া করান হইতেছে যাহা তাঁহার রুচির বিরুদ্ধ, অভ্যাস ও আচারের প্রতিকূল। সন্তানের সুখ ও ভোগের জন্য আজকাল

মাকে সংসার-মধ্যে এমন অনেক কাজ করিতে হয়, যাহার জন্য তাঁহাকে পূজা-আহ্নিক, জপ-তপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে হইয়াছে। অনেক স্থলে এত রকমের কাজ করিতে হয় যে, স্নেহময়ী জননীকে পর্য্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, অথচ পুত্র সে দিকে এক বার চাহিয়াও দেখে না—সে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা করিতেই ব্যস্ত থাকে।

যত কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি মাতার, আর মাতার প্রতি সন্তানের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? মাতার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সন্তান বিচার করিতেছে, কিন্তু মাতার প্রতি নিজের নিজের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে তাহারা এক বারও ভাবে কি? সংসারের কার্য্যে সকল সময়ে পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে যাহাতে নিরুপদ্রবে মাতা ঘুমাইতে পারেন, তাহার জন্য কয় জন পুত্র পয়সা খরচ করিয়া সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করাইয়া দেয়, বা তাঁহার শয্যা-স্থল ঝাড়িয়া বিছানা পাতিয়া দেয়? মাতা কোথায় শয়ন করেন—এ খবর পর্য্যন্ত লইবার অবসর অনেক পুত্রের হয় না। ভরণ-পোষণের জন্য যে খানে মাতাকে পুত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে খানে অনেক স্থলে দাসীর স্থান তাঁহাকে অধিকার করিতে দেখা যায়। কোন্ আদর্শ, কোন্ শিক্ষার ফলে আজ আমাদের এই অবনতি হইয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে কি?

আমাদের যে সুখ- ও ভোগ-প্রবৃত্তির জন্য পরমারাধ্যা জননীকে সংসার-মধ্যে দাসীর মত খাটিতে ও থাকিতে হইতেছে, ঠিক সেই ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যই আমরা দেশমাতাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া দাসী-ভাবে নিযুক্ত রাখিয়াছি। নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায়ে নিজের নিজের অভাব এতই বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে, আর স্বদেশের সামান্য জিনিষে আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সেই জন্য বিদেশের পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আভরণ ও বিলাসোপকরণ আমরা চাহিতেছি, আর আমাদের সাধ মিটাইবার জন্য দেশ-মাতাকে ভিখারিণীর মত এ'র দ্বার ও'র দ্বার করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। দেশমাতার এই দুর্দ্দশায়, এত হীনতায় যদি আমরা লজ্জিত হইতাম, ক্ষোভ অনুভব করিতাম, তাহা হইলে কি আমাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা কমাইয়া অল্পে তুষ্ট হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম না? প্রত্যেকে যদি নিজেকে দীনদুঃখিনী মায়ের সন্তান মনে করিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' পরিয়া ও মুড়ি, চিঁড়ে আর ফ্যান-ভাত খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত, তাহা হইলে কি তাহার দেশমাতার এত দুর্দ্দশা হইত, না পরের অধীন হইয়া তাঁহাকে দাসী-বৃত্তি স্বীকার করিতে হইত? এ দেশের সন্তান হইয়া যদি আমরা অন্য দেশের সন্তান সাজিয়া থাকিতে চাহি, আমরা পিতৃ-

পিতামহের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ভুলিয়া যদি অন্য দেশবাসীর অনুকরণে আহার-বিহার করিতে থাকি, তাহা হইলে দেশমাতা আপন ঘরের জিনিষ দিয়া কি করিয়া আমাদের অভাব দূর করিবেন? আমাদের সন্তোষের জন্য যেরূপ অনেক ঘরে মাতাকে দাসীর মত খাটিতে ও থাকিতে হয়, দেশবাসীর সন্তোষের জন্যও সেইরূপ দেশমাতাকে দাসী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইতেছে।

মাতার দুঃখ যে সন্তান বোঝে না সে অর্থে, শিক্ষায়, যশে, মানে যত বড়ই হউক না কেন—তাহাকে মানুষ বলিতে পারা যায় কি?

অরণ্যে বাস

সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা বলিতে বলিতে একদিন একজন বলিল, "আমার যেন অরণ্যে বাস হইয়াছে!" 'অরণ্যে বাস' কথা দুইটি যেন আমার কাণে বাজিল, অন্তরে আঘাত করিল। এই শব্দ দুইটির মধ্যে যেন এক নূতন চিন্তা, নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম।

'অরণ্যে বাস' বলিলেই যেন শত অভাব, অসুবিধা, বিপদ্ ও বিদ্বেষের মধ্যে বসতি মনে হয়। অভাব ও অসুবিধা হইলেই তাহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করিবে কেন? আর দুঃখ বলিয়া মনে করিলেই কিংবা কষ্ট হইতেছে বলিয়া 'হা-হুতাশ' করিলেই কি দুঃখ থাকে না, বা কষ্ট কমিয়া যায়? একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে 'দুঃখের ভাত'ও সুখে খাওয়া যায়, আর অধীর হইলে সুখের সংসারও ক্রমে দুঃখময় হইয়া উঠে।

কোন অভাব বা অসুবিধা হইলে বিচলিত হইতে নাই। ধৈর্য্য ধরিয়া একটু বিচার করিয়া দেখিবে তাহা প্রকৃত অভাব কিনা; সেই অভাবে উপস্থিত তোমার শারীরিক বা মানসিক কোন ক্ষতি হইতেছে কিনা; সেই অভাব তোমার ভবিষ্যৎ কোন অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে কিনা।

যদি দেখ তাহা প্রকৃত অভাব নহে, বা তাহার জন্য তোমার শারীরিক এবং মানসিক কোন ক্ষতি হইবে না, তাহা হইলে সেই অভাবের নিমিত্ত চিন্তিত না হইয়া বরং নিজেকে এমন ভাবে অভ্যস্ত কর যেন সেইরূপ কোন অভাবকে অভাব বলিয়া আর তোমাকে বোধ করিতে না হয়। তখন দেখিবে, সেই অভাব তোমার কোন দুঃখের কারণ না হইয়া বরং সুখোৎপাদনে সাহায্য করিবে।

অভাব, অসুবিধা বা বিপদে না পড়িলে মানসিক শক্তি আসে না এবং ভগবানে বিশ্বাস জন্মায় না। অভাব ও অসুবিধার ভিতর থাকিয়া যে যত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে, সে ততই কর্ম্মঠ, সতর্ক ও কার্য্যকুশল হইতে পারিবে। অভাবে বা বিপদে যে পড়ে নাই, এ জগতে তাহার কোন পরীক্ষাই হয় নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার পদস্খলন হইতে পারে, অবনতি হইতে পারে। আর যে অভাব ও বিপদের মধ্যেও অবিচলিত থাকিতে বা উন্নতির পথে চলিতে পারে, তাহার মনের খাদ ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং সে একদিন পোড়্খাওয়া পাকা সোণায় পরিণত হইতে পারে।

অরণ্যে বাস করিতে হইলে প্রতি পদে অসুবিধায় পড়িতে হয় সত্য। সাপ, বিছা, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি জন্তুর হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সকল সময়ে সাবধান থাকিতে হয়। অথচ মনে বেশ ধারণা থাকে

যে, সাবধান হইলেও নিষ্কৃতি নাই; সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতেই হয়। সেই জন্য শত সাবধানতা সত্ত্বেও বনবাসী অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; ভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইতে শিখে। তাহারা যখন যে কাজ করে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া করে; কিন্তু উদ্যম বা সতর্কতার কোন ত্রুটি করে না।

বনবাসীর অভাবের সীমা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তাহাদের অভাব যত বেশী আমরা মনে করি, তাহারা তত বেশী মনে করে না। অভাবের মধ্যে থাকিয়া তাহারা আপন আপন স্বভাব এমন করিয়া লয় যে, কোন কিছুতেই তাহারা আসক্ত হইয়া পড়ে না, কিছুরই বশীভূত হয় না। সূর্য্যের অবিরাম গতির ন্যায় তাহাদের গতিও দিবাভাগে বিরাম- ও জড়তা-শূন্য। বিপদে বা দুঃখে তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না; অচল পর্ব্বতের মত তাহারা অবিচলিত থাকে।

অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে বাস করিলেই চিত্তের দৃঢ়তা জন্মায়, স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া মন ধীর, স্থির ও শান্ত হইয়া আসে। তখন সেই মানসিক শক্তি ও ধৈর্য্য লইয়া যদি কেহ কোন কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহা হইলে অবাধ গতিতে সে সেই কর্ম্ম করিতে পারে; স্বাভাবিক সতর্কতাবশতঃ তাহার কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। কর্ম্ম সুফল হইলে সে গর্ব্ব অনুভব করে না, কর্ম্ম ব্যর্থ হইলেও সে ভগ্নোৎসাহ হয় না।

সমাজ-মধ্যে বিশেষ অভাব ও অসুবিধা না থাকিলেও আমাদের দেশে সনাতন আচার-প্রণালী ও রীতি-নীতি কতকগুলি বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বনবাসীর অভাব ও অসুবিধা যদি তাহার চিত্তকে কর্ম্মের উপযোগী করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম আমাদিগকে সতর্ক, সংযত, দৃঢ়, অবিচলিত-চিত্ত ও নির্ভরশীল না করিবে কেন? সংযম- ও নিয়ম-পালনের মধ্য দিয়াই একদিন ভারত উন্নতি করিয়াছিল। যদি আমরা আবার সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে শিখি, তাহা হইলে অনেক স্থলেই সংস্কার ও সমাজ-বন্ধনকে আর কর্ম্ম ও উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করিয়া গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইবে না যে—

"জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি' দিয়া দূর,
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর—
আনন্দে উদার—উচ্চ।"

আচার- ও নিয়ম-পালন করিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে চিত্তে যে সংযম, ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, তাহাই অর্জ্জন করিবার ইঙ্গিত যেন সে দিন 'অরণ্যে বাস' —এই কথা দুইটির মধ্যে পাইয়াছিলাম।

আমাদের দেহ

এক সময়ে পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীকে ৺ কাশীর মহারাজ বহু মূল্যের এক জোড়া কাশ্মীরী শাল দিয়াছিলেন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, পরমহংসদেব সেই শালের জোড়টি ব্যবহার করেন। পরমহংসদেব সেই শাল-জোড়াটি এক বার গায়ে দিয়া, এক বার পাতিয়া বসিয়া পরে একজন লোককে দান করেন। মহারাজ সেই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। সময়ান্তরে ইহার কারণ পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "তুমি যখন আমায় দিয়াছিলে তখন সেই শাল-জোড়াটির উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার হইয়াছে বলিয়া জানিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল শাল-জোড়াটি লইয়া আমি সেইরূপই করিয়াছিলাম। যদি জানিতাম, তুমি সেই জিনিষটি আমার নিকটে গচ্ছিত রাখিতেছ বা আল্‌নায় যে ভাবে কাপড়-জামা রাখ সেই ভাবে তোমার সেই শাল-জোড়াটি আমার দেহের উপর রাখিয়া যাইতেছ, তাহা হইলে সযত্নে সেটি রাখিয়া দিতাম এবং যখন তোমার ইচ্ছা হইত তখনই লইতে পারিতে।"

স্বামী ভাস্করানন্দের এই উত্তরটি আমাদের স্ব স্ব দেহের প্রতি অধিকার-সম্বন্ধে বেশ একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয়। এই যে দেহ—যাহাকে “আমার দেহ” বলি, তাহা প্রকৃতই আমার কি? যদি আমারই হয় তাহা হইলে যত দিন ইচ্ছা আমি ইহা রাখিতে পারি না কেন? দেহটি রাখিতে চাহিলে বা রাখিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও ত রাখিতে পারি না। কোন একটি সময়ে দেহ নষ্ট হইয়া যাইবেই যাইবে। তোমার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পার না, তখন এ দেহে তোমার কোন অধিকার আছে, কি করিয়া বলিব?

প্রকৃত পক্ষে এ দেহে তোমার কোন অধিকার নাই। ভগবান্ ইহা তোমাকে দিয়াছেন। সকল স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি তোমায় দেন নাই; তাঁহার নিজের জিনিষ তোমার কাছে রাখিতে দিয়াছেন মাত্র। তোমার দেহের উপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকার রাখিয়া তিনি তাহা তোমায় অর্পণ করিয়াছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য তোমায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়াছেন। যে দেহ তুমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছ তাহার দ্বারা ভগবদ্দত্ত প্রবৃত্তিবশতঃ তুমি কার্য্য করিতেছ। তুমি যাহা কর, তাহার উপর তোমার কোন অধিকার থাকে না। কর্ম্মের ফলের উপর তোমার কোন হাত নাই।

ভগবান্ যাহা করাইতেছেন তুমি তাহা করিতেছ; তিনি তোমায় যে ভাবে রাখিতেছেন তুমি সেই ভাবে থাকিতেছ। তোমার স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই। সুতরাং তুমি যাহা করিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা ভগবান্ই করিতেছেন, তুমি উপলক্ষ মাত্র হইয়া আছ। যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যাইবে, তখনই তিনি তোমাকে দিয়া আর কোন কাজ করাইবেন না। তখন তোমার দেহের আর কোন দরকার থাকিবে না। তখন ভগবান্ তোমার দেহ হইতে আপন শক্তিটুকু পৃথক্ করিয়া নিজের শক্তির সহিত মিলাইয়া লইবেন। তখন শক্তিহীন দেহ পড়িয়া থাকিবে এবং তাহার দ্বারা আর কোন কাজ চলিবে না। তখনই হইল—মৃত্যু।

এই মৃত্যুর একটি নির্দ্ধারিত সময় আছে। একটি স্বাভাবিক নিয়মে জীবদেহের বিনাশ হইয়া থাকে। সে নিয়ম যে কি, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। মানুষ এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে যে, বিনাশ না হইলে সৃষ্টি হয় না। ধ্বংস ও সৃষ্টি ভগবানেরই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। যাহা আজ ধ্বংস হইবার নহে, যদি চেষ্টা করিয়া তুমি তাহা ধ্বংস কর, তাহা হইলে তুমি স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিলে। প্রদীপে তেল থাকিতেও যেরূপ তুমি ফুঁ দিয়া নিবাইতে পার, সেরূপ তোমার দেহ থাকিবার

সকল সম্ভাবনা সত্ত্বেও তুমি তাহা নষ্ট করিতে পার। যদি কাহারও দেহ দেহীর অনিচ্ছা সত্ত্বে হঠাৎ কোন অস্বাভাবিক উপায়ে নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অপঘাত-মৃত্যু হয় ; আর দেহ থাকিবার সকল সম্ভাবনা সত্ত্বেও যদি কেহ আপন ইচ্ছায় সেই দেহ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাকে বলে আত্মঘাতী, এবং এইরূপ মৃত্যু হইল—আত্মহত্যা।

বিষ খাইলে বা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেই যে কেবল আত্মহত্যা হয়, তাহা নহে। যদি কেহ আপন শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য নিয়ম পালন না করে বা অনাচার, অনিয়ম ও অত্যাচার করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে, কিংবা মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও অন্যরূপ নেশা করিয়া তিলে তিলে শরীর ক্ষয় করে, তাহা হইলেও আত্মহত্যা করা হয়। বুঝি না বলিয়া এরূপ আত্মহত্যা করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

আত্মহত্যা করিবার অধিকার কাহারও আছে কি? দেহ যখন তোমার নিজের সম্পত্তি নহে, তখন তুমি কি করিয়া তাহা ধ্বংস করিতে পার? পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে যেরূপ চুরি করা হয়, বা অন্যের গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ না করিয়া নিজে ভোগ করিলে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তেমনই এই দেহরূপ গচ্ছিত ধন ভগবানের নিকট হইতে পাইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার

করিলেও যে পরস্বাপহারক ও বিশ্বাসঘাতকের কাজ করা হইয়া থাকে। ভূস্বামীর অজ্ঞাতে বিষয় নষ্ট করিলে সেই অকরণীয় কার্য্যের জন্য যেরূপ দণ্ড পাইতে হয়, সেইরূপ ভগবানের অনিচ্ছায়, কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, তোমার দেহ নষ্ট করিলে তোমাকেও সেই মহাপাপের জন্য দণ্ড পাইতে হইবে। যে আত্মহত্যা করে সমাজের সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আত্মঘাতীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য কেহ বহন করিতে চাহে না। সুতরাং যে কার্য্যের ফলে ইহ লোকে অশেষ লাঞ্ছনা ও পর লোকে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা কখনও করিতে নাই।

যদি কেহ নিমেষ-মধ্যে আত্মহত্যা না করিয়া অল্পে অল্পে শরীর ক্ষয় করত আত্মনাশ করে, তাহা হইলে ইহ জন্মেই তাহাকে সেই অবিবেচনার ফল ভোগ করিতে হয়। আচার ও নিয়ম পালন করিয়া, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর আহার-গ্রহণ করিয়া, শরীর সবল রাখিয়া যে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহার সুখের কখনও বিরাম থাকে না। সবল শরীরের জন্য তাহার চিত্ত দৃঢ় হয়, কর্ম্মে নিষ্ঠা আসে এবং হৃদয় উৎসাহ ও তেজে পূর্ণ হইয়া উঠে। এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারে না। কিন্তু যে শরীর ক্ষয় করে, জীবনে সে উন্নতি করিতে পারে না, শরীর অসুস্থ

থাকায় সে কোন সুখ পায় না, কোন কর্ম্মে তাহার উৎসাহ থাকে না এবং বাঁচিয়া থাকিতে হয় বলিয়াই যেন সে বাঁচিয়া থাকে। এরূপ দুর্ব্বহ জীবন বহন করিয়া কেহ কাহারও স্নেহ বা শ্রদ্ধা পায় না এবং সমাজে তাহার কোন প্রতিষ্ঠা হয় না। যে আত্ম-নাশের দ্বারা ইহ জীবনে অবনতি হয় তাহাও কখনও করিবে না।

ভগবানের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই এই দেহ ধারণ করিয়া আছি, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি মনে করিলে এবং সেই মঙ্গলময়ের বিধানে দুঃখের অবসানে ইহ জীবনেই সুখ হইবে এই বিশ্বাস রাখিলে, আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি তোমার কখনও হইবে না। বরং এই বিশ্বাস এক বার জন্মিলে গচ্ছিত ধন মনে করিয়া তোমার দেহ তুমি সযত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে এবং যখন যে কার্য্য করিবে তাহা ভগবানের আদেশ মনে করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে।

প্রতিজ্ঞা

প্রতি বৎসর কত বৃষ্টি হয়। তাহাতে মাঠের কত মাটি-কাদা ধুইয়া যায়, কত স্থানে ভাঙ্গন ধরে। আবার কোন স্থানে-বা অবিরল জল-স্রোত বহিয়া গিয়া গভীর নালা ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হয়। ঝড়েও এক স্থানের ধূলা-বালি উড়িয়া অন্যত্র যায়, কত গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়ে। নদী, নালা, মাঠ, ঘাট একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে প্রতি বৎসরেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে, কিন্তু একটি প্রস্তরখণ্ডে বা প্রস্তরময় কোন পর্ব্বতের চূড়াতে কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পার কি? শতাব্দীর পর শতাব্দী ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত সহ্য করা সত্ত্বেও উহাদিগকে একই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। অথচ তরল জল একটু বাতাসেই নড়িয়া উঠে, চঞ্চল হইয়া পড়ে। বায়ু একটু জোরে বহিলে জলের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকে, জল আলোড়িত হয়। তখন জলরাশি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। জলের মত তরল-মতি লোকের চিত্তও যেন সতত চঞ্চল, আশঙ্কাপূর্ণ, সন্দিগ্ধ। কে কি বলিবে, কে কি মনে করিতেছে

ভাবিয়া সে যেন সকল সময়ে ত্রস্ত, উৎকণ্ঠিত, শান্তিহীন।

আবার দেখ, ছোট গাছপালা সামান্য বাতাসেই দোলে, কিন্তু বড় গাছ তাহাতে টলেও না; তাহার দুই চারিটি পাতা সামান্য নড়িতে পারে মাত্র। কিন্তু ঝড় হইলে বড় গাছের মোটা মোটা ডাল ত দোলেই, গাছের গোড়া পর্য্যন্ত নড়িতে থাকে। ঝড় বেশী হইলে বড় বড় গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া যায়, সময়ে সময়ে গোড়া পর্য্যন্ত উপ্‌ড়াইয়া গিয়া গাছ পড়িয়া যায়। কিন্তু সেই ঝড়েও ছোট গাছ অটুট থাকে; দেখিলে মনে হয় যেন কোন আঘাতই তাহার অঙ্গে লাগে নাই। বৃহৎ বৃক্ষের মত দৃঢ়-চিত্ত আর ক্ষুদ্র তরুর মত লঘু চিত্ত ব্যক্তি তোমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাও। যাহারা দৃঢ়-চিত্ত তাহারা সহজে বিচলিত হয় না, নিজের সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া অন্য পথে যায় না, উদ্দেশ্য-সাধনে পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু এক বার টলিলে সহজে আর শান্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব; তখন নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে তাহারা ভীত হয় না। এই জন্যই দৃঢ়-চিত্ত ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজের অভীষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে।

আবার কতক লোক আছে, যাহারা খাইতে হয় তাই যেন খায়, চলিতে হয় তাই চলে, চাকরি করিতে হয় তাই যেন চাকরি করে।—যেন নিজের ব্যক্তিত্ব নাই, শক্তি

নাই—স্রোত যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায় সেই দিকেই তাহারা ভাসিয়া যায়। দেখলেই বুঝিবে, তাহাদের নিজের কোন চিন্তা নাই, চিন্তার কোন উপাদান নাই। পরের ধারণা, পরের মনোভাব, পরের বিচার তাহাদের ভাবিবার ও আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। তাহারা যে কাজটুকু করে, সেটুকু হুজুকে মাতিয়াই করে; কিন্তু অল্প সময়ে অথবা কয়েক দিনেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া আরব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের দ্বারা কোন স্থায়ী বড় কাজ কখনও হয় না।

যখন গৃহের জানালা হইতে কঠিন, দৃঢ়, উন্নত পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনের মধ্যে একটি আনন্দ অনুভব করি। শত অভাব, শত দৈন্য, শত দুর্ব্বলতার মধ্যেও প্রাণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, শক্তিহীন শরীরেও নব জীবন সঞ্চারিত হয়।—যেন ঐ ভীমকান্ত মহান্ পর্ব্বতকে বলিতে শুনি, 'কত ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেল, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের পর আবার শান্তি স্থাপিত হইল, কত লোক আমাকে দলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আমি স্থির—অটল রহিলাম। সঙ্কল্প অটল হইলে শরীরও অটুট হইয়া থাকে।'

পর্ব্বতের এই বাণী কাণে শুনিলে নিরুৎসাহ, ক্রিয়াহীন জনমণ্ডলী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অতীত কালের দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। তখন এই ভারতবাসীর

হৃদয়ে বল ছিল, শরীরে সামর্থ্য ছিল, চিত্তে দৃঢ়তা ছিল, প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল। তরল জলের আকারের মত তাহাদের 'মুখের কথা' ক্ষণে ক্ষণে পাত্রাপাত্রভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিত না। মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইত তাহা অটল, অচল, প্রস্তরময় পর্ব্বত-শিখরের মত বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াই থাকিত—সে প্রতিজ্ঞার কোন পরিবর্ত্তন হইত না, সে সঙ্কল্পের কোন বিচ্যুতি হইত না।

সেই জন্যই দেখি, পৌরাণিক যুগে নিজের প্রাণনাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজা কংস বসুদেবের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ও দেবকীকে তাঁহাদের বিবাহের পর হত্যা না করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন; সত্য-লঙ্ঘন-ভয়ে পিতা হইয়াও রাজা দশরথ প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন; আর প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া শেষে নিজে চণ্ডালের ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্যই দেখি, বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী মুখের কথা রক্ষার জন্য একবিংশতি দিবস অনাহারে যাপন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে উচ্চচূড় পর্ব্বত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া যেন সকল সময়ে সকলকেই আদেশ করিতেছে—'দৃঢ়-চিত্ত হও, স্থির-সঙ্কল্প হও, সত্য-বাক্ হও; মুখের

কথাকেই প্রতিজ্ঞা বলিয়া স্থিরনিশ্চয় কর।' এ আদেশ পালন করিতে যে মানসিক বলের প্রয়োজন তাহা পাইবার আশায় ভারতবাসী ঈশ্বর-সমীপে কাতর প্রার্থনা করিবে কি ?

বিশ্বপ্রেম

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, একটি ছাগল মাঠে চরিতেছে এবং তাহার পিঠের উপরে একটি ফিঙে পাখী বসিয়া আছে। সে খানে ছোট ছোট গাছ-পালা অনেক ছিল, সুতরাং বসিবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফিঙে পাখীটি ছাগলের উপর চড়িয়া বেড়াইতে-ছিল কেন জানিবার জন্য একটু দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, পাখীটি একটি ফড়িংএর পিছু পিছু উড়িয়া গেল এবং তাহাকে ধরিল। তখন বুঝিলাম, ছাগলের চরিয়া বেড়াইবার সময়ে ঘাস নাড়া পাওয়ায় ফড়িংগুলি লাফাইয়া উঠে, এবং তাহাদিগকে ধরিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ফিঙে পাখী ছাগলের পিঠে চড়িয়া বেড়ায়।

পাখী সেই ফড়িংটি ধরিয়াই উড়িয়া গেল এবং নিকটবর্ত্তী একটি তরুর শাখায় বসিয়া তদুপরি অবস্থিত অপর একটি পাখীকে সেটি খাওয়াইয়া দিল। পাখীর এই ব্যবহার দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, বোধ হয় নিজের ছানাকে খাওয়াইল। কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে ধারণা দূর হইল। দেখিলাম,

দুইটি পাখীই উড়িয়া পরস্পর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতে লাগিল। সে এক বিচিত্র ক্রীড়া, যেন যুদ্ধের অভিনয়,—কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে না, অথচ যেন দুই জনেই দুই জনকে আক্রমণ করিবার জন্য ঘুরিয়া-ফিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের খেলার ভঙ্গিমা হইতে বেশ বুঝিলাম যে, একটি অন্যটি অপেক্ষা হীনবল নহে। পাখী দুইটির ব্যবহার দেখিয়া স্থির করিলাম তাহারা দুইজনে স্ত্রীপুরুষ।

পাখীর মত নিম্ন স্তরের জীবের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মনে হইল যেন বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই এরূপ ঘটনা ভগবান্ আমার সম্মুখে ঘটাইলেন। মানুষের প্রতি তাঁহার দয়ার নিদর্শন ও সৎ শিক্ষা দিবার বিবিধ উপায় দেখিয়া আনন্দে চিত্ত ভরিয়া উঠিল; তখন তাঁহারই শ্রীচরণে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

বিবাহিত জীবনে ত্যাগের আদর্শ যেন এই ঘটনাটির মধ্যে দেখিতে পাইলাম। নিজে সুখী হইব ভাবিয়া, পরের সেবা-যত্ন পাইব মনে করিয়া যে বিবাহ করে, সে বিবাহের সুখ বুঝিতে পারে না। পাখীটি মুখে করিয়া ফড়িং লইয়া গিয়া অপর পাখীটিকে খাওয়াইয়া যে সুখ পাইল, নিজের ভোগসুখের পথ প্রশস্ত

করিতে ব্যস্ত, স্বার্থান্ধ পুরুষ সে সুখের আস্বাদ কখনও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বিবাহ করিয়া ঐ পাখীর মত যে নিজেকে ভুলিতে পারে, নিজের ভোগ, নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া যে স্ত্রীর সুখের জন্য চেষ্টা করিতে পারে, নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া যে স্ত্রীর কষ্ট মোচন করিতে পারে, সে এক নির্ম্মল আনন্দ পাইয়া থাকে। ভোগে যে সুখ পাওয়া যায়, ত্যাগ হইতে তাহার শতাধিকগুণ আনন্দ মানুষ পাইতে পারে। বিবাহ অন্যের কথা ভাবিবার অবসর আমাদের দিয়া থাকে। ত্যাগে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ বিবাহের পর আমরা পাইয়া থাকি। সে সুযোগ যে গ্রহণ করে, সংসারের দুঃখ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। দুঃখ-মোচনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ভিতরে সে আনন্দ পায় এবং যত বেশী সে অন্যের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়, ততই তাহার আনন্দের মাত্রা বাড়িতে থাকে।

আপনার স্বার্থ ছাড়িয়া পরের জন্য ভাবিতে না শিখিলে, পরের জন্য খাটিতে না পারিলে এ আনন্দ পাওয়া যায় না। বিবাহ আত্মচিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যের সুখ-চিন্তা করিবার সুযোগ দেয় বলিয়াই বিবাহ প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বার।

বিবাহ করিয়া যে আপনাকে ভুলিতে না পারিল,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারবর্গের সহিত যে আপনাকে মিশাইয়া না দিল, সংসারের কুটিলতা ছাড়াইয়া প্রেমের রাজ্যে প্রবেশাধিকার সে পাইল না। বিবাহ তাহার পক্ষে বন্ধন-স্বরূপ হইল; স্ত্রীপুত্রকন্যা কঠিন শৃঙ্খল-স্বরূপ হইল; সংসার একটি বিচিত্র কারাগার হইল। তখন ভোগাকাঙ্ক্ষাই তাহার একমাত্র কাম্য, অর্থাগম-চিন্তাই ধর্ম্ম, এবং সঞ্চিত অর্থের ভোগই তাহার মোক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। তখন সে প্রেমময় ভগবানের দিকে না চাহিয়া আপন সংসারের অভাব-অভিযোগের দিকেই চাহিয়া দেখে,—যদি কোন কারণে ভগবান্‌কে মনে পড়ে তাহা হইলে তাঁহাকে মঙ্গলময় মনে না করিয়া অমঙ্গলময় বলিয়াই ভাবে। তখন তাহার চিত্ত সঙ্কীর্ণ, প্রকৃতি হীন এবং মন অপ্রফুল্ল হইয়া উঠে।

কিন্তু যে নিজেকে ভুলিয়া স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারে, আপনার সুখের সকল সামগ্রী স্ত্রীপুত্রকে প্রদান করিয়া যে নিজের জন্য অপর কোন সুখ কামনা না করিয়া তাহাদের সুখেই সুখী হইতে পারে, তাহার চিত্ত কখনও সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে না, তাহার প্রেম কখনও আপন স্ত্রীপুত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। সে প্রেম স্ত্রীপুত্র হইতে পরিবারবর্গে, পরিবারবর্গ হইতে প্রতিবেশীতে,

এবং প্রতিবেশী হইতে জনসাধারণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখনই সে প্রকৃত প্রেমের মর্ম্ম ও আনন্দ বুঝিতে পারে, সংসার-মধ্যে মঙ্গলময় ভগবানের বিধান দেখিতে পায়, প্রেমময় ভগবানের প্রতিচ্ছবি আপন অন্তঃকরণে অনুভব করিতে পারে। তখন সংসার তাহার নিকটে ভোগের রাজ্য বলিয়া অনুভূত না হইয়া কর্ম্ম- ও ধর্ম্মভূমি বলিয়াই বোধ হয়। অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতে সে বিরক্ত হয় না, দেবতার পূজায় সে আনন্দ বোধ করে এবং প্রত্যেক সৎ কর্ম্মই দেবসেবা বলিয়া মনে করে। প্রেমের রাজ্যে তাহার আনন্দের আর কোন বাধা থাকে না; তাহার মনের সুখ ও মুখের হাসি ফুরায় না। চিত্তের ময়লা কাটিয়া গিয়া সে ক্রমে শিশুর মত সরল ও নির্ম্মল হইয়া দাঁড়ায়।

ভালবাসা ও স্নেহকে সংসার-সীমায় বদ্ধ না রাখিয়া ক্ষুদ্র 'স্ব'কে প্রসারিত করিবার, পরের মাকে মা ও পরের সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করিবার এবং বিবাহিত জীবনে সুখ-ভোগ উপেক্ষা করিয়া নিজের দুঃখ দূরী-করণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পরের দুঃখ মোচনের উপায়-উদ্ভাবনের ইঙ্গিতই যেন সেই পাখী দুইটি আমাকে করিল।—যেন তাহারা বলিল, 'নিজের চিন্তা অপেক্ষা পরের চিন্তাকে বড় করিলে আমাদেরই মত চির-

আনন্দ,—চিরশান্তি প্রকৃতির কোলে বসিয়া ভোগ করিতে পারিবে।' সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল, ঠিকই ত—

" পরের তরে আপন ভুলে
পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও। "

সঙ্গদোষ

নদি, তুমি ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল। তোমার অন্তরে ত কোথাও কোন ময়লা থাকে না। যদি উপরে কিছু আসিয়া পড়ে তাহা হইলে অচিরেই তুমি তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া কূলে রাখিয়া আইস। যদি তোমার ভিতরে কোন জিনিষ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তুমি তাহাকে ক্রমশঃ দলিত করিতে করিতে আপন পদতলে রাখিয়া দাও। সেই জন্যই দেখি, তোমার পদতলে কত পাথর, কত ইট, কত মাটি, কত বালি পড়িয়া আছে। তুমি তাহাদিগকে হীনবল করিয়া আপন আধিপত্যে এরূপ ভাবে রাখ যে, তোমার উপরে কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহারা করিতে পারে না। তোমার প্রাধান্য অস্বীকার করিতে বা কোনরূপে তোমায় কলুষিত করিতে তাহারা কখনও সমর্থ হয় না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, তুমি স্বভাব-নির্ম্মল।

কিন্তু আজ তোমাকে এত আবিল, এত পঙ্কিল, এত ক্লেদময় দেখিতেছি কেন? তোমার অন্তরে ময়লা, বাহিরে ময়লা—যেন তুমি ময়লা মাখিয়া থাকিতেই

ভালবাসিতেছ! যে ময়লা আসিয়া পড়িলে তুমি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শত চেষ্টা করিতে, আজ সেই সব আবর্জ্জনা তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়া রহিয়াছে কেন? বুঝিয়াছি, তুমি কোন পাপের প্রলোভনে পড়িয়াছ, কিংবা কোন অসৎ সঙ্গী তোমার সাহচর্য্য করিতেছে। সেই অসৎ সহচর তোমার পাশে-পাশে থাকিয়া অহরহঃ তোমার অন্তরে বিষ ঢালিতেছে। তাহাতেই তোমার নির্ম্মল চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, পাপে আসক্তি আসিয়াছে। সেই পাপীর সংসর্গে তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে, তাই তুমি আজ পাপকে আর পাপ বলিয়া মনে করিতেছ না।

বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা হয় দেখিয়া সেই ঘোলা হইবার কারণ তুমি হয়ত আমায় কত ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে। তুমি হয়ত বলিবে, মাটি-কাদা জলে আসিয়া মিশিয়াছে বলিয়া আজ নদী এরূপ আবিল হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, জল ত কখনও মাটি ছাড়া থাকে না; অথচ সে নির্ম্মল থাকে কেন? মাটির উপর দিয়া যখন নদী বহিয়া যায় তখনও সে আপন শরীর-মধ্যে, আপন অন্তরে মাটি প্রবেশ করিতে দেয় না। কিন্তু আজ যে দিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে; নতুবা আপন নির্ম্মল শরীর সে কখনও এরূপে

কলুষিত করিত না। এ রহস্য কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?

আমার বোধ হয়, বৃষ্টিই ইহার কারণ। বৃষ্টির জলকে অত্যন্ত তরল, অত্যন্ত চপল দেখিয়া দেবতারা আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের পার্শ্বে আর তাহাকে স্থান দিলেন না। তখন বৃষ্টি মনের দুঃখে আকাশ ত্যাগ করিয়া বারি-বিন্দুরূপে নামিতে লাগিল। নামিতে নামিতে যখন সেই বারি-বিন্দু পৃথিবীকে দেখিতে পাইল তখন মনের আক্রোশ মিটাইবার জন্য চারি দিকের মাটিতে যত পারিল ছড়াইয়া পড়িল। একের উপর অভিমান করিয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করত অন্যকে প্রলোভন দেখাইল। এক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় অন্য স্থানে দ্বিগুণ উৎসাহে মোহ সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রলোভনে পতিত হইয়া, রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া মাটি আপন ঘর-দ্বার, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া সুপথ-কুপথ বিবেচনা না করিয়াই জলের সহিত যাইতে আরম্ভ করে। মোহে বশীভূত হইয়া মাটি জলের সহিত এইরূপেই চলিয়া যায় না কি ?

এ সংসারে পাপের এক বিচিত্র গতি! পাপের পথে নামিতে আরম্ভ করিলে যে যত নামিয়া যায় তাহার বেগ ততই বাড়িতে থাকে। সেই জন্যই জলের

সহিত থাকিতে থাকিতে মাটি ও জল—উভয়ের এরূপ অধঃপতন হয় যে, তাহারা সাধারণের সমক্ষেও টলিতে টলিতে, ঢলিতে ঢলিতে অতি ক্ষিপ্র গতিতে নামিয়া আসে। তখন জলের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়। তখন দুই বন্ধু মিলিয়া স্রোতের পথে প্রবাহিত হইয়া গিয়া নদী-শরীর কলুষিত করিতে চেষ্টা করে। কুজন দেখিয়াও নদী তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া আপন নির্ম্মলতা, আপন পবিত্রতা, আপন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অসতের সহিত অসৎ হইয়া উঠে। সেই জন্যই দেখ, বৃষ্টি-জলের সমাগমে ধীরা, স্থিরা, শান্ত-স্বভাবা নদী অধীরা, অস্থিরা, উগ্রা, বেগবতী হইয়া নামিয়া যায়—কোথায় কে বলিবে?

মাটি, বৃষ্টি তোমার সংস্পর্শে আসিল বলিয়াই তুমি তাহার সহিত মিশিতে গেলে কেন? আকাশে ত বৃষ্টি ছিল; কিন্তু কৈ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ত তাহার সহিত মিশিতে যায় নাই? বৃষ্টি আকাশ হইতে যখন নামিয়া আসিল তখন আকাশের কোনও অধিবাসীই ত তাহার সহিত নামিয়া আসে নাই? অথচ সেই বৃষ্টি তোমার নিকটে আসিতে না আসিতেই তুমি নিজেকে ভুলিয়া তাহার সহিত ভাসিয়া গেলে! তোমার এই প্রবৃত্তি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তোমার প্রকৃতি আকাশ-বাসীর প্রকৃতি হইতে কত বিভিন্ন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের

মানসিক শক্তি, নৈতিক বল এবং চিত্তের দৃঢ়তা আছে বলিয়াই তাহারা কাহারও প্রলোভনে পতিত হয় না। তোমার সে শক্তি নাই। সেই জন্য প্রলোভিত হইতে না হইতেই আপন ব্যক্তিত্ব বর্জ্জন করিয়া তুমি অন্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যাও।

জলের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইতে তোমার যে অধঃপতন হইল তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয়ত বলিবে, 'অসহায় হইয়া থাকিলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রেরও এইরূপ অধঃপতন হইত। তাহাদিগের যে অধঃপতন হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন। দেবশক্তির প্রভাবেই তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে।' প্রত্যুত্তরে বলিব, তোমারও ত শক্তি আছে। ধর্ম্মের শক্তি কি দেবতার শক্তি অপেক্ষা কম? সেই ধর্ম্মকে সহায় করিয়া, সেই ধর্ম্মে প্রাণ-মন অর্পণ করিয়া, তাহারই আদেশ কায়মনো-বাক্যে পালন করিয়া বৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে না কেন? দেখিতে, বৃষ্টি পলাইয়া যাইত, আর কখনও সে তোমাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিত না এবং হয়ত লাঞ্ছনার ভয়ে আর কাহারও নিকটে অগ্রসর হইত না। তখন তুমি ধর্ম্মের প্রভাবে কেবল যে আত্মরক্ষা করিতে তাহা নহে, অপরকেও পাপের পথ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতে।

ইঙ্গিত

পতিতপাবনি গঙ্গে ! শৈশব হইতে তোমার কূলে-কূলে খেলা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া পুত্রস্নেহে আজ বর্ষাকালে তুমি আমায় যে শিক্ষা দিলে, দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে প্রবাহিত হইয়া তোমার সকল সন্তানকে সেই শিক্ষা দিও।

সুশিক্ষা

কেহ কেহ বলেন, দেশে শিক্ষক নাই, তাই তাঁহাদের ছেলেরা ভাল হইতেছে না, তাহাদের উন্নতি হইতেছে না। দেশে যদি প্রকৃত ত্যাগী, কর্ম্মী, শিক্ষানুরাগী শিক্ষক থাকিতেন তাহা হইলে যুবকেরা তাঁহাদের আদর্শে গঠিত হইয়া উন্নত হইত এবং হয়ত দেশের অবস্থাও ফিরিয়া যাইত। ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিয়া কোন অন্যায় করেন না।

শিক্ষক যদি বিলাসিতার স্রোতে ডুবিয়া থাকে, ভোগ-বস্তুর চিন্তা করে এবং নানা উপায়ে আপন ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় নিরত থাকে, তাহা হইলে ছাত্র বিলাসী ও ভোগী না হইবে কেন? শিক্ষক যদি বিদ্যাচর্য্যা অপেক্ষা অর্থাগমের উপায়ের দিকেই অধিকতর মনোযোগী হয়, জ্ঞান অপেক্ষা অর্থের সমধিক সম্মাননা ও সংবর্দ্ধনা করে, তাহা হইলে তাহার ছাত্রের চিত্তে জ্ঞানের স্পৃহা আসিবে কোথা হইতে? প্রকৃতই শিক্ষকতা করিবার উপযুক্ত, ছাত্র-হিতৈষী, প্রেমিক শিক্ষক কমিয়া আসিতেছে বলিয়াই এ দেশের ছাত্রমণ্ডলে এত অবনতি ঘটিতেছে।

শুধু শিক্ষকের অভাবেই কি আমাদের এতটা অবনতি হইয়াছে? আমার বোধ হয়, ইহা প্রধান কারণ হইলেও সমগ্র কারণ নহে। ধান-ক্ষেতের পাশে বসিয়া থাকিলে আমি অনেক সময়ে সেই কারণটি অনুভব করি। যখন গাছগুলি খুব ছোট থাকে তখন সকল ক্ষেতই সমান দেখায়। তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। মনে হয়, সকল ক্ষেতেই যেন একই রকমের ধান এবং সমান পরিমাণে ফসল হইবে। গাছ অনেকটা বড় হইলেও বিশেষ কোন বিভিন্নতা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন শীষ বাহির হয় এবং তাহাতে ধানের মঞ্জরীগুলি ধরিতে থাকে, তখনই ধান্যের পরস্পর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বর্ণ- ও আকার-ভেদে ক্ষেতগুলির বিভেদ দেখা যায়। ফল ধরিলে সমস্ত মাঠটি সবুজ মখ্‌মলে ঢাকা বলিয়া মনে হয় না,—কারুকার্য্য-করা নানা বর্ণের চেক-দেওয়া গালিচা-মোড়া বিশাল প্রাঙ্গণ বলিয়া বোধ হয়। ফসলেরও ইতর-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জমি একরূপ হইলেও কোনটিতে বেশী, কোনটিতে কম ফসল হইয়া থাকে। এক মাঠের মধ্যে একই প্রকার জমিতে ফল ও ফসলের এরূপ বিভিন্নতা হয় কেন?

বীজ-ধান বিভিন্ন হইলে যেমন একই ক্ষেত্রে ধানের আকার ও ফসলের পরিমাণ বিভিন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ একই শিক্ষকের অধীন থাকিয়াও প্রকৃতি-ভেদে ছাত্র ভিন্ন

ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সুতরাং ছাত্রের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি শিক্ষকের উপর যত নির্ভর করে, ছাত্রের প্রকৃতির উপর তাহা অপেক্ষা বেশী নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বীজ একই স্থান গ্রহণ করিলেও যেরূপ বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে, সেইরূপ একই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিশেষত্বের জন্য ছাত্রগণ বিভিন্ন শক্তি ধারণ করে। সেই শক্তি ও আদর্শের পার্থক্যের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

সুতরাং ছাত্রের উন্নতি করিতে হইলে,—কর্ম্মী, সাহসী, উৎসাহী ছাত্র পাইতে হইলে তাহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তন-সাধন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দ্বারা কখনও সফল হয় না। শিক্ষক এই গঠন-কার্য্যে কতকটা সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু গড়িতে পারেন না। সন্তানের প্রকৃতি-গঠন নির্ভর করে মাতাপিতার শিক্ষাদানের উপর, তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্য ও কার্য্যের উদ্দেশ্যের উপর। প্রকৃতির উন্নতি-সাধন করাইবার জন্য সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয় না। প্রত্যেক সংসারই সেই শিক্ষার স্থান এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই তাহাদের পাঠ্য। সে শিক্ষার স্থান যত পবিত্র হইবে, আচার-পালন ও ধর্ম্মভাব তাহাতে যত অধিক মাত্রায় থাকিবে, সংযমের প্রভাব

তাহারা যত বেশী অনুভব করিবে, কর্ম্ম যত স্বার্থশূন্য, নিষ্কাম হইবে ততই সন্তানের প্রবৃত্তি সৎ, উদার ও নিঃস্বার্থ হইবে। চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে এবং সংযমের আনন্দ ও ত্যাগের সুখ এক বার অনুভূত হইলে উত্তরকালে শত ভোগী, বিলাসী, অর্থলোলুপ শিক্ষকের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিলেও ছাত্রের আদর্শের পরিবর্ত্তন হইবে না। সে যে ভাবেই শিক্ষিত হউক না কেন, দেশের ও দশের অমঙ্গল তাহার দ্বারা কখনও সাধিত হইতে পারিবে না।

শিক্ষক

(সেকালের ও একালের)

সেকালের শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের নিকটে যেরূপ সম্মান পাইতেন আজকাল আমরা শিক্ষকমণ্ডলী সেরূপ পাই না। শিক্ষককে শুধু মাষ্টার মহাশয় বলিয়াই তখনকার ছাত্রেরা ক্ষান্ত হইত না। ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলিয়া মনে করিত এবং মাতাপিতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু শিক্ষকের প্রতি সম্মান ও ভক্তি একালের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এখন আর কোন স্নেহের বন্ধন নাই, কোন ভালবাসা নাই; সে মধুর গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ আর তাহাদের ভিতর দেখা যায় না। দেশ ত সেই একই রহিয়াছে তবে এখন গুরুশিষ্যের সেই প্রাণস্পর্শী সম্বন্ধ, সে সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইল কেন ?

হয়ত তুমি বলিবে, ছাত্রের অবনতিই ইহার কারণ। ইহা অপেক্ষা আর কোন গুরুতর কারণ আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিলে না ; কেবল এক কথায় ছাত্রের অবনতিই ইহার কারণ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে। বিচারের

সময়ে সাধারণতঃ আমরা নিজেদের ছাড়িয়া বিচার করি; দোষ অনুসন্ধান করিবার সময়ে অন্যের দোষই খুঁজিয়া বেড়াই। সেই হিসাবেই কি তুমি ঐরূপ কারণ দেখাইলে?

আমি বলি, গুরুশিষ্যের মধুর বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে আমাদের আদর্শের পরিবর্ত্তন। এ দেশ এখনও তাহাই রহিয়াছে সত্য, এ দেশবাসী সেই আর্য্য-প্রসূত তাহাও সত্য; কিন্তু তাহাদের অস্থি-মজ্জা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই দেখ, আদর্শ অন্য রূপ হইয়াছে; হাব-ভাব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন কি করিয়া আশা করিবে যে, পূর্ব্বের সম্বন্ধ, পূর্ব্বের আত্মীয়তা বর্ত্তমান থাকিবে? কারণের পরিবর্ত্তন হইলে কার্য্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তবে যাহাদের রক্তে পূর্ব্ব-স্রোতের শেষ-তরঙ্গটুকু আজিও অবস্থিত কেবল সেই সকল ছাত্রের মধ্যেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শিক্ষকের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের প্রবৃত্তি এখনও দেখা যায়।

পূর্ব্বে যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেন তাঁহারা শাস্ত্র-চর্চ্চায় এবং জ্ঞান-অর্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন। শিক্ষার আর আবশ্যকতা নাই, জ্ঞান-অর্জ্জন সম্পূর্ণ হইয়াছে বা পণ্ডিত হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া তাঁহারা ছাত্রের অনুসন্ধান করিতে বাহির হইতেন না। যদি কেহ তাঁহাদের শিক্ষা বা জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাহা হইলেই

তাঁহারা শিক্ষক হইতেন। আজকালের মত শিক্ষক হইবার ইচ্ছা বা আগ্রহ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। শিক্ষকের কার্য্যের ভিতর তাঁহারা বিশেষ লোভের বা লাভের কিছুই দেখিতেন না। শিষ্য পাইলে তাঁহারা বিদ্যা দান করিতেন, আমাদের মত বিদ্যা বিক্রয় করিতেন না। অর্থের প্রতি লোভ তাঁহাদের ছিল না। ছাত্রের নিকট হইতে অর্থ-প্রাপ্তির আশা কখনও করিতেন না বলিয়া অতিসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারা শিক্ষার্থীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিতেন। তাহাতেই পরস্পরের মধ্যে স্নেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইত, একটি পবিত্র বন্ধন, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত।

বিদ্যাদান পুণ্যকর্ম্মরূপে গৃহীত হইত বলিয়া সে-কালের শিক্ষকেরা সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী হইতেন। একালের শিক্ষকেরা সমাজে বা ছাত্রের অভিভাবক-দিগের নিকট হইতে কোন সম্মান পান না। অন্ন-দান সৎ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় দাতা সাধারণের নিকটে যে সম্মান পাইয়া থাকে, কিন্তু হোটেলওয়ালা যেমন সে সম্মানের এক কণামাত্রও পায় না, সেইরূপ আমাদের শিক্ষাদানও পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয় না; এবং সেই জন্য শিক্ষকতা করিয়া আমরা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষকের এই

অর্থমূলক বিদ্যাদানের জন্য গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে এক বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে ছাত্র শিক্ষকের নিকটে আসিত, আর একালে শিক্ষক ছাত্রের নিকটে গিয়া থাকে। সেকালে শিক্ষকের চরিত্র-গুণে, প্রকৃতির বিশেষত্বে, চিত্তের দৃঢ়তায়, সংযম ও স্বার্থ-ত্যাগের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্য শিক্ষকের পদানত হইয়া থাকিত; আর একালে অনেক সদ্‌গুণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় শিক্ষক ছাত্রের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। তুমি একালের শিক্ষক হইয়া কি করিয়া ছাত্রের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইবার আশা করিবে? তোমার সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার অগুণে যে তোমার সুনাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। সেই জন্যই দেখি, একালে "মুড়ি-মিছরির এক দর" হইয়াছে।

সীতাগড়, তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া এক জন সেকালের শিক্ষকের আদর্শ দেখাইতেছ। তোমার অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংসের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়াই সেকালের আদর্শ একালেও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছ। যখন তোমার অবয়বে কোথাও শিখর, কোথাও গহ্বর,—কোথাও পাথর, কোথাও জল,—কোথাও মার্জ্জিত সমতল ভূমি, কোথাও অরণ্য,—কোথাও আলোক, কোথাও অন্ধকার,—কোথাও রৌদ্র,

কোথাও মেঘ দেখি, তখন মনে হয়, যেন সেকালের কোন শিক্ষকের পদতলে বসিয়া আছি। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় যেন তাঁহার চরিত্রের উৎকৃষ্ট ভাব দেখিতেছি এবং নিকৃষ্ট অংশটুকুও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন সদ্‌গুণের শিখর-প্রদেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে উঠিতে গগন স্পর্শ করিতেছে। মনে হইতেছে, যেন কখনও তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তায় ও কঠোর শাসনে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, আবার কখন-বা তাঁহার স্নেহ-রসে স্নিগ্ধ হওয়ায় পিতৃভ্রম হইতেছে। এক বার মনে হইতেছে, যেন তাঁহার চিত্ত অতিসরল—সুগম, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যে ও গভীর চিন্তায় বোধ হইতেছে, সে চিত্ত বড়ই জটিল—দুর্গম; তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? মনে হইতেছে, যেন কখনও চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল আবার কখনও বিষাদে ম্রিয়মাণ। কখনও মনে হইতেছে, যেন আশার জ্যোতিতে তাঁহার অন্তর উজ্জ্বল, প্রফুল্ল—আবার কখনও বোধ হইতেছে, যেন দুরাশায় সে হৃদয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত, স্ফূর্ত্তিহীন।

হে পর্ব্বত, তোমার মধ্যে দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, স্নেহ, সহানুভূতি, একনিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু আড়ম্বরের সহিত তুমি সেই গুণাবলী দেখাইবার

জন্য কোন চেষ্টা কর না, বা আমাদের মত ছাত্র-সংগ্রহের জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়াও বেড়াও না। যদি কেহ তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমার দিকে চাহিয়া দেখে তাহা হইলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে এবং ভক্তিভরা সেই হৃদয়-দর্পণে তোমার নীরব উপদেশ প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে ধন্য করে।

সঙ্গীত

একটি ছোট ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “তুমি গান জান কি?” সে তখনই উত্তর করিবে,—“জানি” এবং সাধ্যমত স্বর করিয়া গান করার অনুকরণ করিবে। অথচ তোমায় যদি গান করিতে বলা হয় তাহা হইলে তুমি গান ত করিবেই না, উপরন্তু অনেক রকম ওজর-আপত্তি দেখাইবে। তুমি কি সত্যই গান জান না? আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। হইতে পারে যে, তুমি ভাল গান জান না, বা তোমার গলা খুব মিষ্ট নয়; কিন্তু একেবারে গান জান না—ইহা কি কখনও হইতে পারে? গান জানে না এমন মানুষ ত আমি দেখি না। শুধু মানব কেন, আমার বোধ হয়, জীব মাত্রই, এমন কি জড়-জগৎও গান করে। তবে তোমায় গান করিতে বলিলে করিবে না কেন? তোমার গানে অন্যে সন্তুষ্ট হইবে না ভাবিয়াই তুমি বোধ হয় গান করিতে সাহস কর না।

গান কি পরের জিনিষ, না পরের জন্য করা হইয়া থাকে? ঐ যে পাখীটি গাছের ডালে বসিয়া

গান করিতেছে, সে কি তোমার জন্য গাহিতেছে? তুমি শুনিবে বলিয়া বা শুনিয়া সুখী হইবে বলিয়া কি সে গান করে? আড়াল হইতে না শুনিয়া তুমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও; দেখিবে, পাখীটি অমনি গান বন্ধ করিবে। হয়ত তাহার গানের ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া সেই স্থান হইতে সে উড়িয়া যাইবে। কিন্তু তুমি আড়ালে থাকিয়া তাহাকে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, পাখীটি মাঝে মাঝে পালক ফুলাইতেছে, পাখা নাড়া দিতেছে—যেন মনের আনন্দে তাহার সর্ব্ব-শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছে। দেখিবে, গান করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সে থামিতেছে, যেন আনন্দে বিভোর—আত্মহারা হইয়া সেই নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতেছে। তোমাকে শুনাইবার জন্যই যদি পাখীটি গান করিত, তাহা হইলে তাহার এত আনন্দ হইত কি?

পাখী গান করে আপনার আনন্দের জন্য। তাহার গানের কোন ভাষা আছে কিনা জানি না; যদি থাকে, তাহা হইলে ভগবানের গুণকীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই তন্মধ্যে প্রধান। ভগবান্ এবং প্রকৃতির রাজ্য ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জন্য গানের ভিতর দিয়াই পাখী ভগবানের উপাসনা করে, তাঁহারই গুণগান করে এবং অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আবার জড়-জগতের দিকে চাহিয়া দেখ। সে খানেও সেই একই ভাব দেখিবে। দেখিবে, বায়ু ও জল আপন আপন কলতানে আনন্দে মাতিয়া থাকে। তুমি যখন বায়ুর স্পর্শ অনুভব কর, তখন কি তাহার সেই পুলক-সঙ্গীত শুনিতে পাও না? বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি, বাঁশ-পাতার সর্‌সর্ শব্দ, ঝাউ-পাতার সন্‌সন্ স্বন, এবং উলু-ঘাসের খস্‌খস্ স্বরের সহিত সুর মিলাইয়া বায়ু যে অপূর্ব্ব একতান গীত গাহিতে থাকে তাহা কে না শুনিতে পায়? বোধ হয় সকলেই তাহা শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া উপভোগও করে। সেই জন্যই দেখি, তুমি যখন ঘরে বসিয়া একমনে কোন কাজ করিতে থাক, তখন বায়ু জানালার পার্শ্বে শোঁ-শোঁ শব্দে গান করিয়া উঠিলে তুমি অন্যমনস্ক হইয়া যাও। তখন তোমার হাতের কাজ হাতেই থাকে, কিন্তু মন গান শুনিবার জন্য উদাস হইয়া বায়ুর সঙ্গে উধাও হয়। বড় হইয়াছ বলিয়া বায়ুর সঙ্গীত শুনিবার জন্য তুমিই শুধু যে আকৃষ্ট হও তাহা নহে; ছোট ছোট শিশু, এমন কি পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বায়ুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেই তাহার সহিত ছুটিয়া যায়। সেই জন্যই দেখিতে পাও, বায়ু গান করিয়া উঠিলেই পাখীরা সেই সঙ্গীত-স্রোতে গা-ভাসান দিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আর কত মুক্তপক্ষ আনন্দোচ্ছ্বসিত বিহঙ্গম মনের সুখে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই গান শুনিতে থাকে।

জড়-জগতে আর এক মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, সে সঙ্গীত জলের। যে খানে জলের মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইবে, দেখিবে, যত ক্ষণ জল সে খানে থাকিবে তত ক্ষণ সেই গান হইবে, কেবল জলের বিলোপের সঙ্গেই সে গান থামিয়া যায়। সে মধুর কল-কল, গদ্-গদ নাদ তোমার মনে বিপুলতর আনন্দের সঞ্চার করে, সত্য; কিন্তু তুমি কি মনে কর যে, তোমার তৃপ্তির জন্যই জল অমন কলমধুর গান করিয়া থাকে? তুমি শোন বা নাই শোন, জল তাহার মৃদুগম্ভীর সঙ্গীত গাহিবেই। একতানে একভাবে সে গান করিয়া যাইবে এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে গানের বিরাম থাকিবে না।

জলধারা দেখিতে এবং তাহার গান শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। প্রবাহের পরিবর্ত্তে জল যখন কোন স্থান জুড়িয়া নিথর হইয়া থাকে তখন তাহা দেখিতে তত ভাল লাগে না। তখন জল যেন আপন মোহন মূর্ত্তি হারাইয়া ফেলে। যদিও তখন জল নিজেকে নানা আভরণে ভূষিত করে, যদিও তাহাতে ফুলের রাজা পদ্ম অনুপম শোভা বিস্তার করিয়া সে অঙ্গের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হারাইয়া জল যেন কেমন অসুন্দর হইয়া উঠে। অথচ প্রবাহিত বারিধারা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কত সুন্দর, কত নির্ম্মল, কত

পবিত্র! তাহার সঙ্গীতালাপ যেন শিশুর হাসির মত শ্রুতিসুখকর।

জল যখন বিস্তৃত ও প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে তখন আপন প্রসার বাড়াইবার জন্য, অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার জন্য সে যে-শক্তি প্রয়োগ করে তাহাতে হীন-বল হইয়া যায়। সেই শক্তিক্ষয়ে তাহার মানসিক বল এত কমিয়া যায় যে, সে তখন অল্প কারণেই বিচলিত হয়, আপনার বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলে। সেই জন্যই দেখ, জলরাশি যত বড়ই হউক না কেন, প্রবাহ না থাকিলে ঈষৎ বায়ু-সঞ্চালনে তাহা হিল্লোলিত হইয়া উঠে, তরঙ্গ উত্থিত হয়,—সামান্য কারণেই যেন তাহার চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা যায়। কোন স্থানে আঘাত লাগিলেই চাঞ্চল্য যেন সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, যেন মন পর্য্যন্ত বিহ্বল করিয়া দেয়। সেই জন্য জল যখন আবদ্ধ হইয়া থাকে, যখন তাহার মধ্যে কোন সঙ্গীত থাকে না, তখন তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে না। কিন্তু যখন সেই জল প্রবাহিত হইয়া গান করিতে করিতে ছুটিয়া যায়, যখন তাহার প্রতি প্রবাহে নৃত্যাভিনয়রূপ তরঙ্গ-ভঙ্গ লক্ষিত হয়, তখন তাহার সেই শিশু-সরল স্বভাব, সেই শিশু-সুলভ নৃত্য আমায় বড় আনন্দ দেয়। মধুর কলনাদিনী, মৃদু-তরঙ্গাকুলা স্রোতস্বিনীর প্রতি

আমার সেই ভালবাসার প্রতিদান-স্বরূপ জলধারা আমায় কত কথা বলে, কত শিক্ষা দেয়।

কল্লোলিনি, তোমার কূলে বসিয়া যখনই সেই মন-ভোলানো সঙ্গীত শুনি এবং তোমার মাধুর্য্য দেখি, তখনই মনে হয় তুমি সর্ব্বদা গান কর বলিয়াই তোমার শরীর ও মনে কোন চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। তোমার চিত্ত গানেই মুগ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, গানের ভিতর দিয়া তোমার মন ভগবানের উপাসনায় নিরন্তর রত থাকে বলিয়া, তোমার দৃষ্টি চারি দিকে পড়ে না এবং সেই জন্যই তুমি মোহ-মুগ্ধ হও না। যখন তুমি ভগবানের চরণে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া, আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া, বিশ্বপিতার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বহিয়া যাও, তখন যেন আমি তোমায় বলিতে শুনি,—'চল চল, ঢল ঢল, বল বল।' তুমি বল বটে, কিন্তু আমি তোমার মত অহর্নিশ লক্ষ্যপথে চলিতে, প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতে এবং মধুর বিভুগুণগান করিতে পারি কৈ?

সাধুসঙ্গ

নদি, আজ তোমায় এত ব্যস্ত দেখিতেছি কেন? তুমি যেন কোন বাধা মানিতেছ না, কাহারও কোন নিষেধ শুনিতেছ না, কেবল ঝোঁকের মাথায় চলিয়া যাইতেছ। তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার একটু সন্দেহ হয়; ভয় হয়, পাছে তুমি কোন কুপথে গিয়া পড়। কিন্তু তোমায় যতই দেখিতেছি, আমার আশঙ্কা ততই কমিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে সৎ হইবার জন্য আগ্রহ না জন্মিলে, সাধুতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে এরূপ নিরবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠা, এরূপ উন্মাদনা হইত না।

মানুষের মধ্যেও এরূপ আগ্রহ সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যখন কোন লোভে পড়ে বা মোহের বশীভূত হয়, তখন সেই মোহের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ জন্মায়। সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ কাম্য পদার্থের দিকে বেগে অগ্রসর হয়। যদি কেহ যত্ন করিয়া সেই আগ্রহ লক্ষ্য করে তাহা হইলে দেখিবে যে, কুপথে যাওয়ার জন্য আসক্তি সকল সময়ে চিত্তে সমভাবে থাকে না। মোহের সময়ে আগ্রহ বাড়ে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইলেই

অনুশোচনা আসিয়া আগ্রহকে একেবারেই শিথিল করিয়া দেয়। তখন চিত্তে আর কোন মোহ থাকে না। সেই অনাসক্তির সঙ্গে-সঙ্গে মনের সকল আনন্দ লোপ পায় এবং দারুণ ক্ষোভে তখন সে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

কিন্তু এরূপ অনুশোচনা স্থায়ী হয়.না। অনুশোচনার পর মোহ ফিরিয়া আসে বলিয়া আসক্তি একেবারে নষ্ট হয় না। পুনরায় যখন আসক্তি দেখা দেয়, তখন আবার সেই কার্য্যে বা সেই পদার্থের জন্য আগ্রহ ফিরিয়া আসে। এই ভাবেই মানুষ আসক্তি ও অনাসক্তির মধ্যে দোদুল্যমান থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই খানেই মানুষের আসক্তি ও আগ্রহের সহিত নদীর আসক্তির প্রভেদ। নদী যখন যে পথে চলে, তখন সেই পথেই একলক্ষ্যে অগ্রসর হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া আসে না।

যদি কেহ কখনও ভাল, কখনও মন্দ না হইয়া নদীর মত একলক্ষ্যে, অবিরামগতিতে কুপথে যাইতে পারে তাহা হইলেও তাহার আসক্তি কমিবার একটু সম্ভাবনা থাকে। খর-স্রোতা নদী যেরূপ নিম্ন-পথে অতিবেগে নামিয়া যায় এবং সমতল ভূমি পাইলে যেমন তাহার বেগ অচিরেই মন্দীভূত হইয়া আসে, সেইরূপ ভোগের পথে থাকিতে থাকিতে বা নিরন্তর কুকার্য্য করিতে করিতে ভোগীর চিত্তে এরূপ অনাসক্তি

আসিয়া যায় যে, প্রলোভন আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, অন্যায় কার্য্যে আর তাহার কোন আগ্রহ থাকে না। তখন অনুশোচনা আসিয়া আসক্তির স্থান গ্রহণ করে এবং মোহ কমিয়া যাওয়ায় আকাঙ্ক্ষার বেগ মন্দীভূত হয়—যেমন নদী-শরীর কোন হ্রদে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, বা অন্য কোন বিপুলকায়া নদীতে পড়িয়া বিলীন হয়।

নদী কোন হ্রদে আসিয়া মিলিলে বা উপনদী কোন প্রধান নদীতে মিশিলে যত ক্ষণ একের জল অন্যের জলের সহিত সম্পূর্ণভাবে না মিশে, তত ক্ষণ যেরূপ জলের বর্ণ ও স্রোতের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং নদীর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, সেইরূপ আসক্তি অনুশোচনার মধ্যে বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু নদীর জল হ্রদের জলের সহিত মিশিয়া গেলে যেমন দুই শরীর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ অনুশোচনার দ্বারা আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হইলে চাঞ্চল্য চলিয়া যাওয়ায় চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন শাখানদী হইতে প্রভূত জলরাশি আসিয়া পড়ায় প্রধান নদীর শরীর যখন বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহার বেগ কোন ক্ষুদ্রকায়া পর্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীর বেগ অপেক্ষা কম হইলেও জলের পরিমাণের জন্য

তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। তখন নদীর গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার জলরাশি দুই কূল ভাসাইয়া নূতন পথে আপন গন্তব্য স্থান করিয়া লইয়া সমধিক খরস্রোতে ছুটিয়া চলে। কোন বাধা পাইলে নদীর গতি .যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, অনুশোচনা-রূপ প্রতিবন্ধক আসিয়া আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিলে মানুষের দৈনন্দিন কার্য্যেও তেমনই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নদীর মত তখন মানুষেরও আকার-প্রকারের পার্থক্য উপস্থিত হয়। তখন নিজের পূর্ব্বাভ্যাস সে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া অভিনব রূপ ধারণ করে 'ও সাংসারিক সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়া আপনার যাত্রাপথ রচনা করিয়া লয়। তখন তাহার অন্তর পরমানন্দে ভরিয়া উঠে।

যখন কাহারও চিত্তে এইরূপ সন্তোষ আসে, এই জিনিষটা পাইলাম না, বা এত আশা থাকা সত্ত্বেও নিরাশ হইতে হইল বলিয়া যখন সে ক্ষুব্ধ না হয়, তখন ভাগ্য-বলে যদি তাহার সাধুসঙ্গ ঘটে তাহা হইলে সে কোন একটা নূতন উদ্দেশ্য স্থির করে। গন্তব্য স্থান একবার স্থির হইলে নদী যেরূপ অবিরাম গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হয়, মানুষও সেইরূপ অনন্য-চিত্তে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে।

সত্যবাদী, সর্ব্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই যে, তোমার চিত্তের উন্নতি হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সাধুসঙ্গ হইতে কোন ফল-লাভ হয় না। একাগ্রতা না জন্মিলে কখনও কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। একমনে, একলক্ষ্যে প্রবাহিত হয় বলিয়াই নদী প্রশান্ত-হৃদয়, পরম-প্রেমিক সাগরের সঙ্গ-লাভ করিতে পারে। চিত্ত স্থির, শুদ্ধ, নিবিষ্ট না হইলে কি করিয়া তুমি সাধু-সঙ্গ লাভ করিবে এবং লাভ হইলেই-বা কি ফলোদয় হইবে ?

প্রকৃতির নির্ম্মলতা

জলের মধ্যে তুমি কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাও কি? আমার যেন মনে হয়, জল সহজে ময়লা হয় না, খারাপ হয় না; তাহার রূপের শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জলের এই প্রকৃতি অন্য কোন পদার্থে দেখিয়াছ কি?

হয়ত তুমি বলিবে, "দুধ জল অপেক্ষা কিসে কম? তাহার মূর্ত্তি কেমন সৌম্য—শুভ্র! কলঙ্কের কোন চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যায় না। বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে, গন্ধে দুধের সহিত জলের তুলনা হইতে পারে কি?" সত্য বটে, কাশপুষ্প-সদৃশ সফেন দুগ্ধ দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার একটা নিজের রূপ আছে; সে রূপ পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; পাত্রাপাত্র-ভেদে তাহার পার্থক্য হয় না। কিন্তু জলের কোন রূপ নাই, কোন রং নাই। জলের পরিমাণ খুব বেশী হইলে তাহাতে একটি রং দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে রং ধার-করা, তাহা জলের নিজস্ব নহে। সুতরাং বর্ণ বা বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিচারে জল কখনও দুধের সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু রং বা

বাহিরের চটক্ ছাড়া আর কোন বিষয় কি বিচার করিবার নাই ?

তোমার ত নিজের বিচার-শক্তি আছে। ভাল-মন্দের ধারণা তোমার আছে। সেই ধারণা লইয়া তুমি কিছু দিন ধরিয়া দুধের ব্যবহার দেখ দেখি। দেখিবে, কিছু অধিক ক্ষণ তোমার সম্মুখে থাকিতে থাকিতেই দুধের রূপের পরিবর্ত্তন হইবে। তখন তাহার রূপ আর তেমন ঢল-ঢল নির্ম্মল বলিয়া বোধ হইবে না। যখন রূপের আকর্ষণী শক্তি কমিয়া আসিবে, কিছু দিন মাধুর্য্য ভোগ করিবার পর যখন রূপের প্রতি মোহ তোমার চিত্ত হইতে অল্পে অল্পে চলিয়া যাইবে, তখন তুমি তাহার গুণ বিচার করিতে আরম্ভ করিবে। গুণ বিচার করিতে বসিলেই দুধে কেমন একটা গন্ধ অনুভব করিবে,—যেন কোন-না-কোন সদ্‌গুণের অভাবে বাহ্য সৌন্দর্য্য আর তেমন সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিল না। যত সময় যাইবে, সে গন্ধ ততই তীব্র বোধ হইবে,—যেন তোমার সংস্পর্শে থাকিয়াও দুধ তোমার মনোভাব, তোমার আচরণ, তোমার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিল না,—যেন সে নিজের বিশেষত্ব, প্রকৃতির বৈষম্য নষ্ট করিয়া তোমার অনুরূপ ভাব ধারণ করিতে পারিল না,—যেন সে তোমার সন্তোষ-অসন্তোষের কথা না ভাবিয়া আপন রুচির অনুযায়ী পথ অবলম্বন করিয়াই চলিল।

সেই জন্যই তুমি তাহার মধ্যে এমন একটি গন্ধ অনুভব করিলে, যাহা প্রথমে তোমার একেবারেই ভাল লাগিল না। পরে সেই গন্ধ এরূপ তীব্র, এরূপ অসহ্য হইল যে, তুমি তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিলে। সেই জন্যই দেখি, রূপ থাকিলেও গুণের অভাবে সে রূপ কদর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

বিকৃত দুধের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে যদি তোমার ঘ্রাণশক্তি বিকৃত হইত, যদি তুমি সেই গন্ধ-গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া যাইতে, চিত্তের অবনতি হওয়ায় যদি তুমি ভাল-মন্দ বিচার করিতে না পারিতে, তাহা হইলে তুমি আর সে দুধে কোন খারাপ গন্ধ অনুভব করিতে না। দুধের যে দুর্গন্ধ বা যে অন্যায় আচরণ ও অসৎ গুণের জন্য অপর লোক তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিত, তোমার বিকৃত ঘ্রাণশক্তি, বিকৃত চিত্তের জন্য তুমি তাহারই মধ্যে কোন অগুণ দেখিতে পাইতে না এবং তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও হইত না। তখন যেন তুমি তোমার নিজের বিশেষত্ব, নিজের বিচার-শক্তি হারাইয়া তাহারই সহিত মিশিয়া যাইতে। তখন তোমার হিতাহিত-জ্ঞান প্রায় লোপ পাইত। রূপের মোহে তোমার চিত্ত-বৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন হইত যে, তখন তুমি আর সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, সদয়-নির্দ্দয় ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কোন

পার্থক্য দেখিতে পাইতে না। তখন সেই বিকৃত দুধের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকার জন্য তোমার শরীর হইতেও দুর্গন্ধ বাহির হইত ; মন অপ্রফুল্ল হইত। সেই অপ্রফুল্ল চিত্তের জন্য মানসিক শান্তি, অন্তরের সন্তোষ, প্রকৃতির ধৈর্য্য নষ্ট হইত। তখন তুমি সঙ্কীর্ণ, নির্ম্মম, কঠোর হইয়া উঠিতে। মোহের প্রভাবে বিচার-শক্তি-শূন্য হইয়া এইরূপে তুমি মানুষ হইয়াও অমানুষ হইয়া যাইতে।

এইবার জলের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। জলের অরূপের মধ্যেও যেন রূপ দেখিতে পাইবে। মনে হইবে, যেন সে রূপের কোন সীমা নাই। পাত্র পরিবর্ত্তন করিলেই যেন সে রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অপরিষ্কার পাত্রে রাখ, জল অপরিষ্কার দেখাইবে। সেই জল পরিষ্কার পাত্রে ঢাল, নির্ম্মল বোধ হইবে। দেখিবে, অপরিষ্কার পাত্রে থাকিয়াও জল তাহা হইতে কোনরূপ মলা-মাটি গ্রহণ করে নাই।—যেন তাহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ ; কেবল অবস্থা-ভেদে বা সঙ্গ-দোষে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। পুনরায় সেই জল কোন কাচ-পাত্রে রাখ, দেখিবে, জল ঝক্‌মক করিবে। জলের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া তুমি বেশ বুঝিবে যে, তাহার মনে যেন কোনই অহমিকা নাই, নিজস্ব বলিবার কিছুই সে রাখে না।—সে যেন সকল অবস্থাতেই

নিজেকে অন্যের সহিত মিলাইয়া দিতে ব্যস্ত।—সে যেন ধনীর কাছে গর্ব্বভরে এবং নির্ধনের কাছে দীনভাবে থাকিতে চায়। জলের এই ব্যবহার হইতে মনে হইবে বিশেষত্ব না থাকা, অবস্থা-বিশেষে ব্যক্তিত্ব বা বিশিষ্টতা না থাকাও যেন একটা গুণ। এই অদ্ভুত গুণের আদর ভারতবাসীই চিরদিন করিয়া আসিতেছে এবং সেই জন্যই এত দুর্দ্দিনেও এ-দেশবাসীর সাংসারিক জীবনের শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

জলের দিকে চাহিতে চাহিতে তুমি তাহার মধ্যে আর একটি গুণ দেখিতে পাইবে। এই গুণে ভূষিত মানবের মধ্যে কোন আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গুণ কাহারও থাকিলে জাঁক্-জমক থাকে না, আত্মাভিমান বিলুপ্ত হয় এবং সেই জন্যই জন-সমাজে এই গুণের বিশেষ কোন আদর হয় না। কিন্তু কাহারও সহিত থাকিতে থাকিতে তাহার এই গুণ একবার অনুভূত হইলে সেই অবধি চিত্ত তাহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে। তখন যতই তাহার নিকটে যাওয়া যায়, ততই আরও নিকটে যাইতে ইচ্ছা হয় এবং যেন মিলনেও সাধ মিটে না।

জলের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে দেখিবে, জল স্বচ্ছ; তাহার ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে এবং তাহার ভিতর ও বাহিরের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারিবে

না। জলের এই বিশেষত্ব মানব-প্রকৃতিতেও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন দেখিবে, কেহ হাল-ফ্যাসানে বাঁকা কথা না বলিয়া সোজা কথা কহিতেছে ও সহজভাবে তোমার কথার উত্তর দিতেছে এবং তাহার কথা ও কাজের মধ্যে যখন কোন অসামঞ্জস্য দেখিবে না, তখন তাহাকে জলের মত স্বচ্ছ—সরল বলিয়া জানিবে। প্রকৃতির এই বিশেষত্ব কখনও নষ্ট হয় না। স্থান-বিশেষে বা অবস্থা-ভেদে আবর্জ্জনা আসিয়া তাহাকে আবিল করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া ক্ষণিকের জন্য তাহাকে স্থিরভাবে রাখিয়া দাও, দেখিবে, সকল ময়লা কাটিয়া গিয়া তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিবে।

জল, তোমার এই স্বচ্ছ—নির্ম্মল প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া আপাত-সুন্দর অথচ অসরল, বাহ্য-শুদ্ধ অথচ কূটবুদ্ধি কুটিলকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। জানি না, ইহার ফলে সংসারে সুখ পাইব কি দুঃখ পাইব।

সাধুতা

সংসারের বিবিধ কার্য্যের মধ্যে নানা ভাবে আমাদিগকে পাপ-কার্য্য করিতে হয়। কখনও প্রাণি-হত্যা, কখনও পর-পীড়ন,—কখন পরস্ব-গ্রহণ, কখন পরস্ব-অপহরণ,—কখন-বা অত্যাচার, কখন-বা অনাচার, এবং অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা বলিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে হয়। যাহাদিগকে সকল সময়ে এত পাপের মধ্যে থাকিতে হয় তাহারা কি কখনও ভাল হইতে পারে,—না, ভাল হইবার চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব? সংসারীর ধর্ম্ম সাধুতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একেবারে বিপরীত বলিলেই হয়।

সংসারীর পক্ষে সাধুর গুণ অর্জ্জন করা অসম্ভব মনে করি বলিয়াই সংসার করিতে বসিয়া আমরা এত নিবিষ্ট চিত্তে সেই কাজই করি, যাহাতে প্রকৃতি ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া যায়। সংসার-জীবনে অর্থের উন্নতি ও পুত্র-কন্যার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা এরূপ চিন্তিত হই যে, অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হই না। সাধারণের নিকটে সম্মান ও যশ পাইবার জন্য আমরা এরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি

যে, নিজের সুবিধার জন্য অন্যের ক্ষতি করিতেও দ্বিধাবোধ করি না। সংসার করিতে করিতে যশ, মান, ধনের চিন্তায় আমরা এরূপ আত্মহারা হইয়া যাই যে, অন্য কোন চিন্তা আর মনের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতেও পারে না। তখন আমরা সম্পূর্ণ সংসারী হইয়া উঠি।

সংসারের মোহ যেরূপ কোন না কোন বিষয়ের আসক্তি জন্মাইয়া আমাদের চিত্ত তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ ভোগ ও প্রণয়ের মোহ চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া আমাদিগকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া ফেলে। সেই বিমুগ্ধ অবস্থায় আমরা হিতাহিত-জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকি। সংসার করিতে বসিয়া যাহারা অল্পে বিচলিত হয়, তাহাদের মধ্যে এরূপ অবনতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন প্রকার নৈতিক অবনতি সংসারীর পক্ষে বিশেষ হীনতার পরিচায়ক না হইলেও, সাধুর নিকটে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্য সংসারী সাধু হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে এবং সাধুও সংসারীর নিকটে যাওয়া-আসা পছন্দ করেন না।

অথচ সাধুসঙ্গ বা সৎ-গুরু-লাভ চিত্তের উন্নতি-সাধনের অন্যতম প্রধান উপায়। সংসার করিতে হইলেই কি মোহের অধিকার হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব? তবে কি সংসারীর চিত্ত স্বার্থপরতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার

মোহ হইতে মুক্তি এবং অনুদার আত্মচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না? তবে কি সংসার-মধ্যে থাকিয়া কেহ সাধু হইতে পারেন না?

একদিন একটি পিতলের ঘড়া লইয়া কোন এক স্রোতঃশূন্য নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। নদীর নির্ম্মল জলে নিমজ্জিত অর্দ্ধাঙ্গ বেশ দেখা যাইতেছিল। নদী-গর্ভ বালুকাময়; সুতরাং স্নানার্থীর পদসঞ্চালনেও সে জল পঙ্কিল হইত না। আমি সেই নির্ম্মল জলে স্নান করিলাম। শরীরের অবসাদ ও ক্লেদ দূর হওয়ায় তৃপ্তি বোধ হইল। তখন পানীয় জল লইবার জন্য ঘড়াটি আনিতে উপরে উঠিলাম।

বালু ও মৃত্তিকা দিয়া যখন ঘড়াটির ভিতর ও বাহির মাজিতেছিলাম, তখন মনে হইতেছিল ঘড়ার ভিতরের অংশ পরিষ্কার করা যত সহজ, আহা! মানুষের মন পরিষ্কার করা যদি তত সহজ হইত! নির্ম্মল জলে শারীরিক ক্লেদ পরিষ্কার করা যেরূপ সম্ভব, চিত্ত-বিকার দূর করা যদি সেইরূপ সম্ভব হইত, তাহা হইলে আজ এই নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া কত পবিত্র হইতে পারিতাম! তখন মনের আধার এই মানব-দেহ জলের আধার কলস হইতে কত পৃথক্ তাহা অনুভব করিলাম এবং কলস পরিষ্কৃত করিয়া জল ভরিবার জন্য জলে নামিলাম।

মাটি-মাখা কলস জলে ডুবাইতেই জল ঘোলা হইয়া গেল। কলসের ভিতর-বাহির ধুইয়া বেশ পরিষ্কার করিলাম। তখন কলস চক্‌চক করিতে লাগিল। কলসটিকে পুনরায় জলে ডুবাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিলাম। পরে আবার কলসটিকে ডুবাইলাম কিন্তু সে বার আর তৎক্ষণাৎ তুলিতে ইচ্ছা হইল না। যখন কলস জলের তলায় ধরিয়াছিলাম তখনও তাহার উজ্জ্বল, মার্জ্জিত শরীর সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। জলের তলায় থাকিয়া কলস যেন বলিতেছিল, 'জলের ময়লা কাটিয়া গিয়াছে, তাহা আবার পরিষ্কার হইয়াছে।'—দেখিলাম, প্রকৃতই জল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং কলস তাহার মধ্যে কতকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। আগ্রহের সহিত কলস তুলিলাম, কিন্তু কলসের স্থান এক মুহূর্ত্তের জন্যও শূন্য বোধ হইল না।—পূর্ব্বে যেরূপ জলপূর্ণ ছিল তখনও সে-স্থান সেইরূপই জলপূর্ণ দেখিলাম। পুনরায় কলস জলে বসাইলাম; দেখিলাম, জল সরিয়া গিয়া কলসকে আপন অঙ্কে স্থান দিল। তখন কলস ও জলের ব্যবহারের মধ্যে যেন একটি সত্য, একটি আদর্শ দেখিতে পাইলাম।

মনে হইল, কলসকে আপন অঙ্কে স্থান দেওয়াই যেরূপ জলের ধর্ম্ম, সেইরূপ কোন চিন্তা আসিলেই

তাহাকে স্থান দেওয়া মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কলস যত ক্ষণ জলের ভিতর থাকে তত ক্ষণ সে-স্থানে যেরূপ অন্য কিছু প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ মনের মধ্যে যত ক্ষণ কোন এক চিন্তা থাকে, তত ক্ষণ অন্য চিন্তা তাহার মধ্যে আসিতে পারে না। কলস জল হইতে তুলিয়া লইলে জলপূর্ণ সে-স্থান যেরূপ অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ এক চিন্তা চলিয়া গেলে মন অন্য চিন্তাকে স্থান দিয়া থাকে। জলের সহিত মনের এরূপ ভাব-সম্মেলন থাকা সত্ত্বেও এমন একটি পার্থক্য আছে যাহার জন্য জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিতে পারে, কিন্তু মন তাহা পারে না। জলের বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে তুমি যে জিনিষই আন না কেন, বা যে ভাবেই তুমি তাহার সহিত ব্যবহার কর না কেন, সে কোন স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকিবে না।

মহতের সহিত মিলিত হইবার, সৎসঙ্গ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জলের চিত্তে সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই জল এই বিশেষত্ব অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। তুমিও যদি সৎ চিন্তা ও সৎ কার্য্য করিবার আগ্রহ সকল সময়ে মনোমধ্যে রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমিও জলের মত নির্ম্মল থাকিতে পারিবে। কুচিন্তা, স্বার্থপরতা, প্রলোভন তোমার মনে জাগিতে

পারে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সৎ-চিন্তার প্লাবনে চিত্ত পুনরায় নির্ম্মল হইয়া যাইবে। সৎ চিন্তার আকর্ষণ ও অবস্থিতির জন্য মনে অন্য কোন চিন্তা সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং প্রবেশ-লাভ করিলেও অধিক কালের জন্য স্থান-গ্রহণ করিয়া থাকিবে না। সংসারের সকল কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তখন তোমার চিত্ত হীন হইতে পারিবে না। তখন তুমি সৎ চিন্তা ও সৎ কার্য্যের আধার হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকিবে।—সংসারী হইয়াও তখন তুমি সাধু হইতে পারিবে।

জল-কলস ভাল করিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়াছিলাম বলিয়াই এই শিক্ষা দিয়া সে আমার প্রত্যুপকার করিল। কাহারও কোন উপকার করিলে সে কার্য্য একেবারেই নিষ্ফল হইতে পারে কি ? জগতে ছোট-বড় সকল কার্য্যেরই একটা সঙ্গত মূল্য ধার্য্য আছে।

প্রকৃতির পরাভব

প্রকৃতি বলিতে বুঝি—উন্মুক্ত, অসীম আকাশ ও তাহার চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং দিগন্ত-প্রসারিত বিশাল প্রান্তর ও তাহার বৃক্ষ-লতাদি ; আরও বুঝি —এই জল, বায়ু, বিদ্যুৎ ও বজ্র। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র বা বৃক্ষ-লতার কোন শক্তি আছে বলিয়া আমাদের ত মনেই হয় না। আর যদি তাহাদের কোন শক্তি থাকে তাহা হইলে সে শক্তি কম-বেশী হয় না বলিয়া আমরা তাহার কোন ধারণাই করিতে পারি না। জল ও বায়ুর যে শক্তি তাহাও অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে দেখিলে কিংবা বজ্রের শব্দ শুনিলে সে শক্তির অসামান্যতা অনুভব করিতে কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না।

কোন নদীর উপর পুল দেখিলে বা জলের স্রোতে কিংবা বায়ুর সাহায্যে কোন কল চলিতে দেখিলে মনে হয় না কি যে, প্রকৃতির শক্তি খুবই সামান্য এবং মানুষ আপন বুদ্ধি-বলে সেই শক্তির দ্বারা কেমন কাজ করাইয়া লইতেছে? এইরূপ মনে হয় বলিয়াই আজ-কাল কেহ কেহ মানুষের শক্তির নিকটে প্রকৃতির পরাজয়

কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব-শক্তির নিকটে প্রকৃতির পরাভব সম্ভব হইতে পারে কি ?

প্রকৃতি যখন ধীর, শান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে তখনই তাহার শক্তিকে কাজে লাগাইবার সঙ্কল্প মানুষ করিতে পারে। কিন্তু সেই প্রকৃতি যখন উগ্র, রুক্ষ, কঠোর হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই রুদ্র শক্তিকে ব্যবহার করিবার কল্পনা করা দূরে থাক, মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। প্রচণ্ড ঝটিকা বা ঘূর্ণাবর্ত্তে, ভীষণ জল-প্লাবনে, দারুণ অগ্ন্যুৎপাতে বা ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে কত নগর ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে কি শোচনীয় ভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা কে না জানে! কে না জানে যে, একটি জাতির সমবেত শক্তিও প্রকৃতির অসীম শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিতে সমর্থ নহে ? প্রকৃতির এই অসীম শক্তির সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না লইয়াই যদি কেহ বলে যে, প্রকৃতি মানুষের শক্তির নিকটে পরাভূত হইয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব, তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, অথবা প্রকৃতি বলিতে কতখানি বুঝায় তাহার সে ধারণা নাই,—অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। প্রকৃতির পরাভব মানুষের হাতে কোন দিনই হয় নাই এবং কখনও হইবে না। জীবের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময়ী প্রকৃতি যখন দয়া করিয়া

শান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তখনই মানুষ তাহার দ্বারা কোন কোন কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারে। কাহারও সাহায্যে কোন কাজ করিতে সমর্থ হইলেই যদি সাহায্যকারীর পরাভব অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ মানুষের হাতে পরাজিত, এবং দাতা সর্ব্বত্রই গ্রহীতার নিকটে পরাভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মানুষের হস্তে প্রকৃতির পরাভব হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতির নিকট হইতেই তুমি পাইয়া থাক। স্বচ্ছ সরোবর-তীরে জলের ধারে তুমি কখনও দাঁড়াইয়াছ কি? দাঁড়াইলে তোমার শরীরের ছায়া জলের মধ্যে দেখিতে পাইবে। যদি স্পষ্ট না দেখিতে পাও, তাহা হইলে জলের উপর একটু ঝুঁকিয়া দেখিও। জলে যদি কোনরূপ তরঙ্গ না থাকে, তাহা হইলে জল-তলে তুমি তোমার পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। সে প্রতিচ্ছবি তোমার প্রকৃতির অনুরূপ বলিয়াই বোধ হইবে। সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত দিয়া জল একটু নাড়িয়া দাও; দেখিবে, জলের উপর বুদ্বুদ হইয়াছে এবং প্রতি বুদ্বুদেরই মাথায় তোমার প্রতিবিম্ব এককে বহুধা বিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে সকল প্রতিবিম্ব অতিক্ষুদ্র, অতিক্ষণস্থায়ী। স্থির জল-তলে প্রতিবিম্ব দেখিলে মনে হয় যেন তাহার একটি আকার

আছে, আয়তন আছে, স্থায়িভাবে থাকিবার অধিকার যেন আছে। কিন্তু বুদ্বুদের মধ্যস্থিত প্রতিবিম্ব দেখিতে অতিক্ষীণ, অতিক্ষুদ্র,—যেন সে নিজের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিজেই সন্দিহান,—যেন সেই বিরাট্ জল-রাশির তুলনায় তাহা অতিনগণ্য, অতিতুচ্ছ। ইহা দেখিলে মনে হয় না কি যে, বুদ্বুদে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে জলে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতির কোলে মানবও প্রতি মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইতেছে? জলের বুদ্বুদ যেরূপ জলেই মিশিয়া যায়, মানুষের শরীরও সেইরূপ বিলয়ের পর প্রকৃতির পঞ্চভূতে মিশিয়া থাকে। যে শক্তির দ্বারা পঞ্চভূত হইতে শরীরের গঠন হয় তাহাই প্রকৃতির শক্তি। যে মহাশক্তি মানুষের সৃষ্টি- ও ধ্বংস-সাধন করে, তাহা আবার মানুষের হস্তে পরাভূত হয়, ইহা কি কেহ কখনও ভাবিতে পারে?

বিশ্ব-পালন-কারিণী, বিশ্ব-ধারিণী, বিশ্বেশ্বরীর শক্তিই প্রকৃতির শক্তি। ক্ষুদ্র জীব-শক্তির নিকটে সেই শক্তির পরাভব তুমি ধারণা করিতে পার কি? একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, প্রকৃতি সর্ব্বত্রই অজেয়া।

জাতিবিচার

শারদীয়া দুর্গাপূজা আসিলে চারি দিকেই নানাবিধ আয়োজন আরম্ভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ-সংসারে পূজার আয়োজন, ধনীর গৃহে উৎসবের আয়োজন, বারইয়ারী তলায় গীতাভিনয়ের আয়োজন, কাপড়ের দোকানে রং-বেরংএর পোষাক-পরিচ্ছদের আয়োজন, মুদি-ময়রাদের দোকানে বিবিধ সুখভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজন, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের আয়োজন, আর বাঙ্গলা দেশের সহর ও গ্রামের ঔষধালয়ে বহুতর জ্বরঘ্ন ঔষধের আয়োজন দেখা যায়। চারি দিকে এত আয়োজন দেখিয়া প্রকৃতিদেবীও যেন তাঁহার পক্ষ হইতে একটুখানি আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তবে সে আয়োজনের মধ্যে কোন আড়ম্বর থাকে না, বিজ্ঞাপনের ঘটা থাকে না।

শারদ প্রতিমার আবাহনের জন্য প্রকৃতিদেবী যে যে আয়োজন করেন, তাহার মধ্যে দুইটি জিনিষ বিশেষ-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যেন স্থলজ ও জলজ সুপ্রচুর পদ্ম ফুল ও অজস্র সুগন্ধি শেফালিকা-রূপ আভরণ সংগ্রহ

করিতে থাকেন এবং ত্রিলোকতারিণী অম্বিকা আসিলে তাঁহাকে সেই আভরণে ভূষিত করিয়া চরিতার্থ হইয়া যান। মণি-মুক্তা-প্রবালাদি রত্ন এবং বিবিধ সুগন্ধি কুসুম আপন অঙ্কে থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতি পদ্ম ফুল ও শেফালিকা আহরণ করেন কেন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? পদ্ম পাঁকে জন্মায়; তাহা সত্ত্বেও সেই ফুলেরই অত বেশী আদর কেন? শেফালিকার পাতাগুলি অতি-তিক্ত এবং কর্কশ, তবু সেই ফুল দেবতার এত প্রিয় কেন?

পদ্ম পাঁকে জন্মায় বটে, কিন্তু পাঁকের ঠিক উপরে বা পাঁকের অতিনিকটে পদ্ম কখনও ফুটিতে দেখিয়াছ কি? পদ্মদলের গোড়া হইতে পদ্মের কলি বাহির হইলে তাহার উৎপত্তি-স্থল জঘন্য পাঁক ও কাদার নিকটে আর সে থাকিতে চাহে না। সে যেন প্রকৃতির বিশেষত্বের জন্য, স্বভাবের নির্ম্মলতার জন্য, হীনতা ও কদর্য্যতার প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য এবং হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অবস্থিতির জন্য আপন জাতি-কুল ত্যাগ করিয়া উচ্চাদর্শের মধ্যে—নির্ম্মলতার সংস্পর্শে ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করে। পদ্মের কলি যেন আপন নির্ম্মল প্রকৃতির অনুরূপ স্থানে যাইবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ স্থানে গিয়া সতের সংসর্গে পবিত্র হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে যতই বাড়িতে থাকে, ততই যেন সে

আপন আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করে। পদ্মের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার মূল তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে না এবং আপনার নাল বাড়াইয়া দিয়া তাহার ঊর্দ্ধগমনের সহায়তাই করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণ কেমন করিয়া রোধ করিবে? সেই আকর্ষণের মধ্যে—পদ্মের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার সেই চেষ্টার মধ্যে পদ্মদলের যেন একটু তৃপ্তি দেখা যায়। পদ্মের সহিত সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা দেখাইয়া নীচ কুলোদ্ভব লতাসমূহ যেন গৌরব বোধ করে এবং স্বজাতির সেই গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পদ্মও আপন বন্ধন ছিন্ন করে না।

পবিত্র হইবার জন্য জন্মাবধি পদ্মের চিত্তে এরূপ আগ্রহ থাকে যে, পঙ্কিল স্থান ত্যাগ করিয়া, দুর্গন্ধ-যুক্ত জল ত্যাগ করিয়া সে উচ্চ স্তরের নির্ম্মল জলের দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে কুলগত সকল বস্তু ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলতর, পবিত্রতর গগন-মার্গে অবস্থিত মহাশক্তিধর, বিশ্বজ্যোতি, মহান্ ভাস্করের দিকে চাহিয়া থাকে। জল হইতে বাহির হইয়া পদ্ম যখন সুদূর আকাশ-পথের পথিক গ্রহরাজকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য এরূপ বিকশিত হয় যে, দেখিবামাত্র ভোগীর ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন তাহার পবিত্রতা নষ্ট

করিবার জন্য, তাহার সাধনা ভঙ্গ করিবার জন্য নীচ-প্রবৃত্তি জীবকুল উৎসুক হইয়া থাকে। সেই জন্যই দেখি, পদ্ম ফুটিতে না ফুটিতে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা আসিয়া জুটিয়া যায় এবং সততই মধু আহরণের জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করে। তখন পদ্ম আপন হৃদয়-সৌন্দর্য্য কঠিন আবরণে আবৃত করিয়া এবং সেই পবিত্র অন্তঃস্থল কেশর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সর্ব্বদা আন্দোলিত হইয়া কামীকে প্রত্যাখ্যান করে। নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার এই চেষ্টায়, লোভীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার এই প্রয়াসে যেন পদ্মের সকল শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। সেই জন্য আর সে উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু পদ্ম আপন পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং বিতাড়িত পতঙ্গকুল স্থানান্তরে যায়।

এই জন্যই দেখ, পদ্ম জল ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে কিছু দূর গিয়া আর যাইতে পারে না। জীব-জগতের সঙ্কীর্ণতা ও ভোগ-প্রবৃত্তির জন্য পবিত্র-চেতা সাধন-মার্গে স্ফূর্ত্তি পায় না,—ইচ্ছানুরূপ উন্নতি করিতে পারে না। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও চেষ্টা ও উৎসাহের জন্য পদ্ম আপন জীবনে যে উন্নতি লাভ করে তজ্জন্য তাহার আত্মীয়-স্বজন গৌরব বোধ করিতে থাকে এবং পদ্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সকলেই নির্ম্মল ও পবিত্র থাকিবার চেষ্টা করে। একের উন্নতিতে সমস্ত জাতিটা গৌরবান্বিত

হয় বলিয়াই পদ্ম ফুটিয়া থাকিলে পদ্মের সকল পত্র মার্জ্জিত ও উজ্জ্বল দেখায় এবং পদ্মের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মদল হীনপ্রভ হইয়া যায়।

শেফালিকার গুণ পদ্মের গুণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও জীব-জগতে তাহা মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয়। মনুষ্য-সমাজে পরের সুখ ও সুবিধার জন্য কাহাকেও আপন সুখ ত্যাগ করিতে দেখিলে যেরূপ তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ জড়-জগতের মধ্যে শেফালিকার একটি প্রবৃত্তির জন্য দেবতা ও মানুষ তাহাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখে, পরম আদরে তাহাকে সম্মানিত করে। সেই জন্যই দেখি, শিউলি ফুল মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তুমি আদর করিয়া তুলিয়া লও, বা দেবতার তৃপ্তি ও উপহারের জন্য মালা গাঁথিয়া দাও। কোন্ গুণের জন্য শিউলি ফুল দেবতার গলায় বা মাথায় স্থান পায়, তাহা জান কি? ফুটিবামাত্রই সকল গন্ধ ও সৌন্দর্য্য লইয়া ঐ যে শিউলি ফুল আপনা-ভুলিয়া দেবোদ্দেশে ঝরিয়া পড়ে, ইহাই তাহার বিশেষত্ব এবং সেই আত্মোৎসর্গের জন্যই তাহার এত আদর।

হীন কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বিবিধ সদ্‌গুণের আধার বলিয়া পদ্ম ও শেফালিকা যখন দেবতার অঙ্গে স্থান পায়, তখন নীচ বংশে জন্মলাভ করিয়াও উচ্চ

শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষায় ভূষিত মানব সমাজ-মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র না হইবে কেন? সু-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সৎ কর্ম্মের সম্মান না করিয়া তুমি শুধু কুল-গত জাতির সম্মান করিবে কেন? দুর্গা-প্রতিমার চরণে পদ্মের অর্ঘ্য ও গলদেশে শেফালিকার মাল্যকে যেন বলিতে শুনি,—'গুণের বিচার না করিয়া শুধু বংশ-গত জাতি-বিচার করিও না; সদ্‌গুণের সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হইও না, গুণীর পূজা করিতে ভীত হইও না।' মহাদেবীর নির্ম্মাল্য-প্রদত্ত এই শিক্ষা ও আদেশ চিরকালের জন্য আমাদের হৃদয়ে নিহিত থাকিবে কি?

বর্ণাশ্রমীর অধিকারভেদ

একদিন একটি বৃক্ষতলে দেখিলাম, কতকগুলি লতা বৃক্ষ-কাণ্ডে জড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। লতাগুলি খুব সরু। গাছের গোড়ার দিকে প্রায়ই কোথাও পাতা দেখিলাম না, কিন্তু গাছের উপরে লতায় এত পাতা ছিল যে, বৃক্ষ-পত্র তদ্দ্বারা প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। কোন্ জাতীয় লতা জানিবার জন্য কেমন একটা আগ্রহ হইল। আগাছার মধ্যে শুক্নো পাতা জড় হওয়ায় গাছের গোড়ায় এত ঝোপ হইয়াছিল যে, সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইল। তথাপি আগ্রহ দমন না করিয়া উৎসাহের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। গাছ্টির চারিধার অল্প অল্প করিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলাম এবং অচিরেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলাম।

সে খানে অনেকগুলি ঐ জাতীয় লতার চারা দেখিলাম। লতাগুলি প্রায় সূতার মত সরু। পাতাগুলি খুব ছোট ছোট এবং তাহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ। লতাগুলি আকারের অনুপাতে অনেকখানি করিয়া লম্বা হইয়াছিল এবং কিছু-না-কিছু অবলম্বন করিয়া গাছের উপরে

উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃক্ষের উপরে উঠিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে হইল, অন্যান্য লতার মত শীঘ্রই ঐ চারাগুলি গাছের উপরে উঠিবে এবং অসংখ্য পত্রে শোভিত হইয়া গাছটিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। লতার এই ব্যবহার দেখিয়া যেন একটি সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

ঘাসের উপর একখানি চওড়া কাঠ চাপা দিয়া চার-পাঁচ দিন রাখিলে ঘাসের কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? কাঠ বা অন্য কোন জিনিষ চাপা থাকিলে ঘাস আর সবুজ থাকে না; তাহা ক্রমশঃ হলুদ-বর্ণের হইয়া যায় এবং পাতাগুলি পাত্‌লা, সরু ও লম্বাটে হইতে থাকে। মাটিতে ছোলা বা মটর পুঁতিয়া হাঁড়ির মত কোন পাত্র ঢাকা দিয়া রাখিলে কিছু দিনের পর সরু, লম্বা, হলুদ-বর্ণের চারা তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি হাঁড়ির কোন জায়গায় ছিদ্র থাকে তাহা হইলে সেই ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইবার জন্য প্রত্যেক চারাই চেষ্টা করে এবং কিছু দিনের মধ্যে বাহির হইয়া আসে। আলোক পাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবার আগ্রহ প্রত্যেক গাছের মধ্যেই থাকে। সেই জন্য সেই গাছের তলায় জন্মিয়া এবং শুষ্ক পত্রে আবৃত থাকিয়া লতাগুলি প্রথমে সতেজ হইতে পারে নাই; কিন্তু বহু চেষ্টায় সকল

বাধা-বিঘ্ন-অতিক্রমপূর্ব্বক যখন তাহারা মুক্ত স্থানে উঠিবে তখনই সতেজ—স্বাভাবিক পত্রে শোভিত হইয়া সগর্ব্বে অবস্থান করিবে।

লতার সহিত গাছের সম্বন্ধ বিচার করিতে বসিয়া সমাজ-মধ্যে বিভিন্ন বর্ণাশ্রমীর সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুধাবন করিলাম। লতার মত সকল মানুষেরই বড় হইবার, উন্নতি করিবার অধিকার আছে। কিন্তু গাছ যেমন আপন ছায়ার মধ্যে রাখিয়া লতাগুলিকে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, সেইরূপ সমাজ-মধ্যে উচ্চ বর্ণের মানব নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে আপন আপন আধিপত্যে রাখিয়া তাহাদিগকে নানা সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় থাকিতে থাকিতে নিম্ন শ্রেণীর অনেকের চিত্ত হইতে বড় হইবার বা উন্নতি করিবার আগ্রহ একেবারেই লোপ পায়। কিন্তু নানা অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও যাহারা অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে পারে, তাহারা পত্রাবরণ-ভেদ-কারী মুক্তপথাগ্রগামী লতার মতই ক্ষীণভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। যত বড় হয় ততই তাহারা আপন আপন শক্তি বুঝিতে পারে এবং মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। তখন সেই শক্তি এবং ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকও উচ্চ-শিক্ষিত, মার্জ্জিত-বুদ্ধি ও

উদার-চেতা হইয়া থাকে। তখন যদি তাহারা উচ্চ শ্রেণীর নিকট হইতে স্নেহ, সহানুভূতি, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পায়, তাহা হইলে সকল শক্তি ও সামর্থ্য দিয়া তাহারা উচ্চ শ্রেণীকে বিভিন্ন অবস্থায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যদি তাহারা কোনরূপ নীচতা দেখে তাহা হইলে সেই সঙ্কীণতার প্রতিশোধ লইবার জন্য নীচ উচ্চের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। তখন উচ্চ যে নীচের সহায়তা ও শ্রদ্ধা হইতে কেবল বঞ্চিত হয় তাহা নহে, তাহারা নীচের শত্রু ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠে।

বৃক্ষচ্ছায়ায় থাকিয়াও প্রকৃতির সাহায্যে বাড়িতে পারে বলিয়া যেরূপ লতার উৎসাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ উচ্চের আধিপত্যে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোক উচ্চের উপর প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। তখন তাহারা প্রভূত যত্ন- ও উৎসাহ-সহকারে জ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। তখন একের জন্মগত বিশেষত্ব অন্যের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। লতাকে কোনরূপ অবলম্বন প্রদান না করিলেও, আকর্ষ বাহির করিয়া তৎসাহায্যে সে যেরূপ বৃক্ষে উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার

সাহায্যে উন্নতি করিতে করিতে নিম্ন শ্রেণীর লোক একদিন উচ্চ শ্রেণীকে পরাভূত করিতে পারিবে না কি ?

লতার নিকটে বৃক্ষের পরাজয় দেখিয়া মনে হয়, হয়ত কোন দিন সমাজ-মধ্যে বৃক্ষ-স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর লোকের পরাজয় নিম্ন শ্রেণীর হস্তে সাধিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ করিবার পূর্ব্বে, সমাজ-মধ্যে সেই বিশৃঙ্খলার দিন আসিবার পূর্ব্বে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা উচ্চ শ্রেণীর কর্ত্তব্য নহে কি ? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকিলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ জাগ্রৎ না হইয়া হৃদ্যতা বিকশিত হইবে, একতা সংস্থাপিত হইবে, জাতীয় শক্তি বর্দ্ধিত হইবে এবং মিলনের আনন্দ সকলে একত্র উপভোগ করিতে পারিবে।

স্বাভাবিক অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া নীচ জাতির শক্তি-বৃদ্ধি-পূর্ব্বক তাহাকে উচ্চ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লওয়া এখন আমাদের উচিত নহে কি ? পাত্র-অপাত্র, ক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করিয়া যদি একের অধিকার অন্যবর্ণ-সম্ভূতকে দেওয়া যায় তাহা হইলে সমাজ-মধ্যে অনেক স্থলে কর্ম্মীর অভাব কম বোধ হইবে, কর্ম্মের প্রসার বাড়িতে থাকিবে এবং আমরা অল্পে অল্পে উন্নতি করিতে পারিব।

জাতিভেদ *

"যে দেশে জাতিভেদ আছে সে দেশবাসীর মধ্যে একতা কি কখনও সম্ভব?"—এই প্রশ্ন আজকাল ভারতবাসীর মুখে যত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার উত্তর তত শোনা যায় না। বেশ, জাতিভেদ তুলিয়া দিলেই কি আমাদের ভিতর হইতে সকল প্রকার ভেদ-বুদ্ধি ঘুচিয়া যাইবে? আমি ত তাহার কোন আশা, কোন সম্ভাবনাই দেখি না। যেখানে বিভেদ স্বাভাবিক, সেখানে সমতা আসিবে কোথা হইতে? মানুষের ত কথাই নাই, জড়-জগতের কোন এক শ্রেণীর পদার্থের মধ্যেও আমি সমতা দেখিতে পাই না। কোন গাছে এক-গাছ আম, লিচু বা পেয়ারা দূর হইতে দেখিলে সকল ফলই এক রকম দেখায়; কিন্তু একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, একটি ফল অন্য কোন একটি ফলের মত ঠিক দেখিতে হয় না। একটু-না-একটু প্রভেদ তাহাদের মধ্যে থাকিবেই থাকিবে। একটি ফুলের স্তবকে সব ফুল

---

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ইন্দোর-অধিবেশনে পঠিত। ২৫-১২-২৯।

কখনও এক রকমের হইতে দেখিয়াছ কি? একই কাঁদির কলার মধ্যে অনেক ইতর-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এক গুচ্ছ ফল বা ফুলের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায়, তখন ভিন্ন-বুদ্ধি মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না, ইহা কি কখনও হইতে পারে? পার্থক্যের মধ্যেই যে মানুষের মনুষ্যত্ব দেখা যায়। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব যে-লোকের মধ্যে যত বেশী দেখা যাইবে, ইহ জগতে গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া সে তত উন্নতি করিবে, বুঝিতে হইবে।

সমতা-স্থাপনের জন্য মনুষ্য-সমাজ হইতে জাতি-ভেদ তুলিয়া দিলে দেখিবে, অন্য কোনরূপ 'ভেদ' আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। হয় 'শক্তি-ভেদ' না হয় 'অর্থ-ভেদ' আসিয়া সমাজ-মধ্যে অধিক অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করিবে। শক্তির প্রাধান্য অবলম্বন করিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিলে সমাজে কত যুদ্ধ, কত হত্যা, কত বিশৃঙ্খলা যে উপস্থিত হইবে, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 'অর্থ-ভেদ' হইতে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কত অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা হইবে, তাহার কোন ইয়ত্তা থাকিবে কি?

মনে কর সে দিনের কথা, যে দিন এই ভারতে শক্তি ছিল, ভারতবাসীর শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল; যে দিন বীরত্ব ও মহত্ত্বের সমাদর করিতে তাহারা জানিত।

বীরত্বের সম্মান পাইবার জন্য, বীর-আখ্যায় ভূষিত হইবার জন্য এই রাজপুতানার রাজপুত বীরগণ সমাজে কত-না অনর্থ ঘটাইয়াছিল! অতিসামান্য কারণে বিচলিত হইয়া অভিমান-ভরে কত ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যৎসামান্য প্রলোভনে উৎসাহিত হইয়া, কাহারও কোন মিথ্যা রটনায় প্ররোচিত হইয়া, অথবা সামান্য কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কত রাজন্য মিত্ররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া শস্যপূর্ণা, শ্যামলা বসুন্ধরা নর-শোণিত-সিক্ত করিয়াছিল। এইরূপে কত সংসার, কত জনপদ, কত রাজপদ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল। বীরত্বের অভিমানে উত্তেজিত হইয়া রাজপুত জাতি আত্মীয়-বন্ধুর যত রক্তপাত করিয়াছিল, ভারতবর্ষে আর কোনও জাতি তত করে নাই। সামন্ত রাজাদিগের মধ্যে প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য যে জাতির মধ্যে এত অন্তর্যুদ্ধ, এত বৈরিতা দেখা যাইত, যদি সেই সমাজে শক্তির উপর সামাজিক প্রাধান্য নির্ভর করিত তাহা হইলে সেই বীর, নির্ভীক রাজপুত জাতির মধ্যে মনোমালিন্যের সীমা থাকিত কি? একের বিরুদ্ধে অন্যের খড়গ-ধারণের জন্য হয়ত সেই জাতি ভারত-বক্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

অর্থ-ভেদবশতঃ অর্থের প্রাধান্যের উপর যে জাতির সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে, সেই দেশের অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ও আনন্দের কত অভাব তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মার্কিন রাজ্যের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা না থাকিলেও, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা সমাজ-মধ্যে যথেষ্ট আছে। যত প্রকার বিভিন্নতা আছে তন্মধ্যে অর্থমূলক বিভিন্নতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও প্রবল। তাহারই ফলে অর্থ-লোভ ও অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা আমেরিকার অধিবাসীর মধ্যে সর্ব্বাধিক লক্ষিত হয়। সেই জন্য সৎ-অসৎ বিচার না করিয়া যে-কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করে না। পরস্ব-অপহরণের জন্য তাহারা কোন্ পাপ না করে? নরমাংসভোজী পিশাচের মত অর্থ-বুভুক্ষু হইয়া তাহারা অর্থবান্ দেখিলেই হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে। দিবাযোগে রাজপথেও অসতর্ক অবস্থায় পাইলে ধনীকে হত্যা করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। আর ধনরত্নশালী যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলেও তাহার গুপ্তহত্যা সংসাধিত হয়। ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার কোন আত্মীয়কে হস্তগত করিয়া এবং উৎকোচের দ্বারা শান্তিরক্ষক বা পুলিশকর্ম্মচারীকে মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া

তাহারা ব্যক্তি-বিশেষের নিধন-সাধন করে। এরূপ ঘটনা মার্কিন রাজ্যে নিত্য ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য মার্কিন রাজ্যের শাসক-সম্প্রদায় যেরূপ লালসা-পুষ্ট, কর্ত্তব্য-বিমুখ এবং হত্যার সহায়ক এরূপ বোধ হয় আর কোন দেশে দেখা যায় না।

অর্থের সম্মাননার জন্য অর্থোপাসক পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে পরদেশ আক্রমণ, দলন ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি যত অধিক, প্রাচ্য জাতির মধ্যে সে প্রবৃত্তি তত অধিক নহে। বিস্মৃতির অধিকারগত অতীত অভ্যুদয়ের যুগে ভারতবাসী পৃথিবীর নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাভিযান বা দিগ্বিজয়ের জন্য তাঁহারা গমন করেন নাই,—তাঁহারা গিয়াছিলেন বাণিজ্য-বিস্তার, শিক্ষার আদান-প্রদান বা ধর্ম্মপ্রচার করিতে। যদি শক্তি বা অর্থের সম্মাননা ভারতবাসী করিতেন, তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টাকাশে সুখ-রবি এত সহজে অস্তমিত হইত না। ইহ কালের সমৃদ্ধি অপেক্ষা পর কালের সুখের কথা ভারতবাসী অধিক চিন্তা করিতেন। তাহারই ফলে ইহ কালের সুখ হইতে, জাগতিক সকল প্রকার ভোগ-বিলাস হইতে, সম্যক্ ভরণ-পোষণ ও সুচারু আভরণ-আচ্ছাদন হইতে ভারতবাসী আজ বঞ্চিত হইয়াছেন। জানি না, পর কালের কোন সুখের অধিকার তাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না।

তোমরা কি মনে কর, ইংরাজদিগের সমাজ-মধ্যে ভেদাভেদ নাই? অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজদিগকে এ দেশে অভিন্ন ভাবে থাকিতে দেখিয়া মনে কর যে, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ দেশবাসী ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, তাহাদের মধ্যেও সাম্য নাই। একজন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর সহিত একত্র বসিয়া পান-ভোজন করিবেন না। আবার সেই উচ্চ কর্ম্মচারী বিলাতে অনেক সমাজেই দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত হয়ত পাইবেন না। কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শে ইংরাজ সমাজের ভেদাভেদ স্থিরীকৃত হয় না। নানা আদর্শ তাহার মধ্যে আছে—যথা, অর্থ-ভেদ, মর্য্যাদা-ভেদ, বংশ-ভেদ, শিক্ষা- ও শিষ্টাচার- (good breeding) ভেদ, শিক্ষা-প্রণালী-ভেদ। এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইংরাজদিগের—শুধু ইংরাজদিগের কেন, পাশ্চাত্ত্য সকল জাতির বিশেষত্ব এই যে, আবশ্যক বোধ করিলে তাহারা বিভেদ ভুলিয়া সকলে সমবেত হইতে পারে। একই উদ্দেশ্যে কোন এক অধিনায়কের আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারে। সমবেত হইয়া একতা-সম্পাদনের শক্তি, একপ্রাণ হইয়া কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি তাহারা যে শিক্ষা ও যে আদর্শ হইতে পায়, তাহা ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত, অননুসৃত।

জাতিভেদ

ভেদ-বুদ্ধি মানুষের স্বাভাবিক এবং মনুষ্য-সমাজ মাত্রেই তাহা দেখা যাইবে। যদি এই ভেদ-বুদ্ধিই প্রবল হইয়া প্রাধান্য লাভ করিত তাহা হইলে সমাজে বিবাদ-বিসংবাদের জন্য মানুষের উন্নতি হইত না, শান্তি থাকিত না। এই অবনতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য, সুখ-সমৃদ্ধি-রূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নানা অনর্থ ও বৃথা রক্তপাত-নিবারণের জন্য সকল সমাজেই কোন একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন, শক্তিশালী, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষকে প্রাধান্য দিয়া সকলে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। এই পুরুষই দেশের রাজা বা সমাজের নেতা বলিয়া গৃহীত হয়। কোন কোন সমাজে ব্যক্তি-বিশেষের উপর নেতৃত্ব স্থাপন না করিয়া একটি সঙ্ঘের উপর এই ভার অর্পিত হয়।

ভারতবাসী একদিন সমাজ-পরিচালনার ভার দিয়াছিল ব্রাহ্মণের হস্তে। ক্ষত্রিয় রাজা সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, কিন্তু সমাজ শাসন করিতেন ব্রাহ্মণ। ক্ষুদ্র পল্লীসমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রতাপ যেরূপ কোনও কোনও স্থানে আজিও দেখা যায়, একটা বিশাল সাম্রাজ্যেও তদনুরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ রাজাধিক সম্মান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতেন। পরার্থব্রত, পরহিতে জীবন-উৎসর্গ তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। সুমন্ত্রণা, সদুপদেশ ও সৎ-শিক্ষা দান এবং শাস্ত্রানুমোদিত আচার পালন ও

প্রচলন করিয়া ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণের ঐহিক-পারত্রিক সুখ-সংবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা অর্থকামী ছিলেন না। পরার্থের প্রতি লালসা না থাকায় এবং পরস্বাপহরণের জন্য এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে আক্রমণ করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত না দেখায়, ভিন্ন দেশাগত শত্রু কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে, এ ধারণা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য কোন একটি সমবেত শক্তির আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করেন নাই। ধর্ম্মপালন তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল; ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাদের কুলগত প্রবৃত্তি ছিল। সেই কর্ম্মগত ও বংশগত চিত্তবৃত্তিবশতঃ তাঁহারা জনগণ-মধ্যে ধর্ম্মরক্ষার বিধান প্রচার করিয়াছিলেন। সে বিধি, সে নিষেধ, সে আচার ও অনুষ্ঠান এরূপ ছিল যে, ধর্ম্ম আপনা হইতেই রক্ষিত হইত, ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করিতে হইত না। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিস্ট বিধি-নিষেধের প্রভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দীর দাসত্বেও ভারতবাসী ধর্ম্মচ্যুত হয় নাই।

বিধিবিহিত শোক-তাপ, জাগতিক উত্থান-পতন এবং বৈভব-দৈন্যের দিনে শান্তি পাইবে বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ভারতবাসীর চিত্তে ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ এবং ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

ও অচলা ভক্তি থাকায় ভারতবাসী সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দ্দিনে অবিচলিতভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল এবং আজও করিতেছে। এই ধর্ম্ম-বন্ধন চিরস্থায়ী করিবার জন্য, ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রাধান্য সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ব্রাহ্মণের হস্তে কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্পণ করিয়া জাতিভেদের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যখন ভারতবাসী কর্ম্মদোষে স্বদেশের উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইল, তখনও সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব তাহাদেরই হস্তে ছিল। এ স্বাধীনতা বড় কম নহে। সম্যক্ পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতবাসী এ ধর্ম্মমূলক স্বাধীনতা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে। এ স্বাধীনতার মূলে সামাজিকতা তথা জাতিভেদ ; সেই মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আংশিক স্বায়ত্তশাসন বিনষ্ট করিবে কি ?

দূরদর্শী ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ আপন চেষ্টায় যে শক্তি বা যে গুণ অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যদি এক জনের অপেক্ষা অন্য জনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয় তাহা হইলে সমাজ-মধ্যে ভেদের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলার আরম্ভ হইবে, জাতিভেদ হইতে তাহার শতাংশের একাংশও কখন হইতে পারে না। জন্মের উপর কাহারও কোন হাত থাকে না, বা কোন প্রকার প্রভুত্ব খাটে না বলিয়াই

প্রকৃতির অন্যান্য "অত্যাচারের" মত নীরবে এই অত্যাচারটাও লোকে সহ্য করিতে থাকে; অন্ততঃ এ দেশের লোকে এত দিন ধরিয়াই করিতেছিল। জ্ঞান এবং কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত এই 'জাতিভেদ' মনুষ্য-সমাজে বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা আনিতে পারে না। সুতরাং এই 'জাতিভেদ' প্রথা ধ্বংস করিয়া অন্য কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইবার চেষ্টা করা উচিত কি?

জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, সততা, সাধুতা ও ভক্তির সমাদর করিয়া, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাল হইবার, বড় হইবার আগ্রহ জন্মাইয়া, তাহাদের ভালবাসিয়া একই উদ্দেশ্যে একপ্রাণে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে, জাতিভেদ সত্ত্বেও তোমরা অভিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে। আর যদি তুমি জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন না হও, বংশগত প্রাধান্যের প্রভাবে হীন কর্ম্ম করিয়াও ধার্ম্মিক অথচ নিকৃষ্ট জাতির উপর আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিবার চেষ্টা কর, শুধু উপবীত ধারণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব কর এবং যদি তুমি আপনাকে বড় মনে করিয়া নিম্ন বর্ণাশ্রমীকে ঘৃণার চক্ষে দেখ, বিড়াল-কুক্কুরকে আদর করিয়া গরীব দুঃস্থ লোককে অস্পৃশ্য ভাবিয়া অনাদর করিতে কুণ্ঠিত না হও, তাহা হইলে, জাতিভেদ থাক বা নাই থাক, তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী, তোমার জাতির

ধ্বংস অনিবার্য্য, তোমার ধর্ম্ম অন্তঃসার-শূন্য, মৃত—শুধু একটা নিরর্থক সংস্কার মাত্র।

এ বার বারইয়ারী তলায় দুর্গাপূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। জগজ্জননীর আগমনে সর্ব্বত্রই একটি আনন্দোৎসাহ দেখিলাম; আবালবৃদ্ধের মধ্যে নব জীবন-সঞ্চার বোধ হইল। পূজামণ্ডপে আনন্দময়ীর অবস্থিতিতে সকলই আনন্দময় বলিয়া মনে হইল। নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া কত লোক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিল। কেহ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, কেহ-বা বসিয়া রহিল। যাহারা বসিয়াছিল তাহাদেরই একপার্শ্বে থাকিয়া আমিও পূজা দেখিতেছিলাম ক্রমশঃ তথায় লোক-সমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল স্থান সঙ্কীর্ণ—সুতরাং ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়াই সকলে বসিয়া রহিল। কে কাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেছে, এ বিষয় কেহই অনুসন্ধান করিল না এবং দর্শকদিগের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসন্তোষও দেখা গেল না। সকলেই প্রতিমার উপর দৃষ্টি-নিবেশ-পূর্ব্বক তাঁহারই আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিয়াছিল। যখন দেবীর আরতির আরম্ভ হইল তখন পূজারত ব্রাহ্মণের আদেশে বাদ্যকর প্রতিমার সম্মুখে নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল, বালক ও যুবকেরা কাঁসর, ঘড়ি, শাঁখ প্রভৃতি বাজাইতে আরম্ভ করিল, কেহ-বা

ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল পোড়াইতে লাগিল, কেহ-বা প্রতিমার পার্শ্বে গিয়া চামর দোলাইয়া ব্যজন করিতে ব্যস্ত হইল। অবশিষ্ট লোক স্থির হইয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। যত ক্ষণ আরতি হইল তত ক্ষণ কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা, কোন অশান্তি, কোন অসন্তোষ বা বিদ্বেষ দেখিলাম না। কেহ কাহারও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ব্যগ্র হইল না ; এক জনের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া অন্য কেহ তাহার স্থান গ্রহণ করিতে ছুটিল না। তখন প্রতিমার সম্মুখে কেবল এক শান্ত, সাম্য ভাব বিরাজ করিতেছিল।

দেখিলাম, সেই মহাপূজায় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিনিকৃষ্ট জাতীয় লোকের পর্য্যন্ত সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। সেই পূজার মধ্যে যাহার যতটুকু সাধ্য সে সেই কাজটুকু সম্পন্ন করিতেছিল এবং পূজা সুসম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রহ ছিল সকলেরই মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান। সকলের অন্তরে এক উদ্দেশ্য থাকার জন্যই কি নানা ভেদের মধ্যে এরূপ একতা স্থাপিত হয় নাই ? সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহের সীমা ছিল না ; অসন্তোষের চিহ্ন মাত্র কোথাও লক্ষ্য করি নাই। কোন মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে স্বভাবতঃই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ, সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া থাকে। মহামায়ার কৃপায় সকলে পর্য্যাপ্ত আহার্য্য পাইতেছিল ;

কোথাও কোন অভাব ছিল না বলিয়াই কাহারও আনন্দেরও ব্যাঘাত ঘটে নাই।

পূজামণ্ডপে দাঁড়াইয়াই আমাদের জাতিভেদের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, যাহাদের যে অধিকারটুকু এখনও দেওয়া আছে সেই সীমা ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি আজিও তাহাদের হয় নাই। আপন আপন বংশগত কার্য্যে অন্ন-সংস্থান হইলে কেহ অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এখনও চাহে না। উচ্চ জাতীয় কোন ব্যক্তির চেষ্টা বা কার্য্যে কোন নিকৃষ্ট জাতির লোকের অন্নাভাব ঘটিলে, এই শেষোক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকটি আর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না। উচ্চ জাতি আপন আপন স্বার্থ ও সুবিধার জন্য নীচ জাতির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিলেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে। তখন আর কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিবে না। ব্রাহ্মণ যদি জুতার ব্যবসায় করে, মদের দোকান খোলে, শূকর বা মুরগীর বাথান রাখে, তবে সে জাতিগত ভাবেই হউক আর ব্যক্তিগত ভাবেই হউক কোন মুচি, শুঁড়ি বা মেথরের কাছে পূজ্য থাকিবে না।

দেখিলাম, আনন্দময়ী প্রতিমা হাসিতেছেন। আপন সন্তান-মধ্যে একতা-জনিত শৃঙ্খলা দেখিয়া যেন তিনি পরমোৎসাহে সমবেত সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিতে-

ছিলেন। অবিরোধী বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সাম্য ভাব পূজার তিন দিন দেখা যায়, তাহা প্রতি বৎসরের অবশিষ্ট সময়ে আমাদের মধ্যে থাকিবে না কি? সে সম্প্রীতি, সে ভালবাসা, সে মিলন, সে হৃদ্যতা, সে প্রতিদান ও প্রতিগ্রহ আমাদের মধ্যে সকল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-লাভে আমরা কখনও বঞ্চিত হইব না। জাতির ও দেশের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে দেশমাতার পূজাবোধে গ্রহণ করিতে পারিলেই জাতীয় একতা-লাভ অবশ্যই ঘটিবে।

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—এই ভাব সকলকে হৃদ্গত করিতে হইবে।

মুক্তি

সংসার করিতে বসিয়া আমরা সকল সময়েই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কত পথে, কত স্থানে যাইতেছি—কিন্তু কি ফলোদয় হইতেছে? সুখের লোভে বাহির হইতেছি, কিন্তু বহু পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল দুঃখের বোঝা লইয়াই বাড়ী ফিরিতেছি। যখন যে আশা লইয়া গিয়াছি তখন সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় কেবল যে ভগ্নাশ হইয়াছি তাহা নহে,—চিত্তের উৎসাহ, আনন্দ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। দুঃখের বোঝা বহিতে বহিতে, একে একে আশাহত হইতে হইতে এমন একদিন আসিল যখন আর মনে কোনই আকাঙ্ক্ষা বাকী রহিল না, অন্তরে কোন বিশিষ্ট বাসনাকে স্থান দিতে আর ভরসা হইল না; তখন চিত্ত হইতে সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। যখন আশা ফুরাইয়া গেল তখন মুক্তি চাহিলাম। কিন্তু মুক্তি চাহিলেই কি মুক্তি মিলে? মুক্তি চাহিলাম বটে কিন্তু পাইলাম না। বুঝিলাম, মুক্তি কেহ কাহাকেও দেয় না এবং দিতে পারে না।

ইঙ্গিত

সাংসারিক নানা কার্য্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যখনই পথে পথে ঘুরিয়াছি তখন কোথায় কি সুবিধা, কি অসুবিধা বিচার করা সত্ত্বেও বাড়ী ফিরিবার সময়ে ধূলি-ধূসরিত হইয়া ফিরিয়াছি মাত্র,—আর কোন লাভ হয় নাই। কিন্তু একদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিনা উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। পথে গিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু কোন্ দিকে যাইব, কি করিব— কোনই স্থিরতা ছিল না। দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একজন বলিষ্ঠ যুবক সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া নীচকুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হইল। তথাপি তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সরল দৃষ্টি ও স্বকার্য্যের প্রতি আসক্তি দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইল। কিছু দূর তাহার সঙ্গে যাইতে না যাইতেই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা হইল,—যেন তাহাকে ভাল-বাসিতে আনন্দ বোধ হইল। আমার দুই-চারিটি কথায় তাহারও যেন তৃপ্তি হইল,—সামান্য মিষ্ট কথায় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে এত সহজে যে, কোন লোককে বশীভূত করিতে পারা যায়, এ ধারণা পূর্ব্বে আমার ছিল না। পথ চলিতে চলিতে তাহার সহিত যে সকল কথা হইল, তাহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝিলাম যে, কেবল দুই মুঠা খাইতে পাইলেই সে সস্ত্রীক আমাদের সকল কাজ করিতে পারে। এত শক্তি

এত সহজে আমাদের কাজে লাগাইতে পারা যায় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

দুই জনে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে অন্য পথ হইতে আর এক জন আসিল। সে ব্যক্তিও সবল এবং প্রথমাপেক্ষা ঈষৎ উন্নত ও অবস্থাপন্ন। সে সেই দিন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, সে সমস্তই খরচ করিয়া এমন কতকগুলি জিনিষ কিনিয়াছে যাহা না কিনিলেও তাহার অক্লেশে চলিতে পারিত। এরূপ অযথা ব্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "টাকা পেয়েছি, খরচ না ক'রে কি ক'র্‌ব ? কাল্‌কের কথা ভেবে লাভ কি ? কাল আবার গতর খাটিয়ে যা পাব খাবার-পর্‌বার জন্যে তাই খরচ ক'র্‌ব।" এই আগন্তুকের কথা শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। মনে হইল, সে কখনও শিক্ষা পায় নাই এবং সদুপদেশ কেহ কখনও তাহাকে দেয় নাই। সেই জন্য অর্থ ই যে শক্তি তাহা সে বুঝে নাই। দেখিলাম, তাহার উৎসাহ আছে এবং সুযোগ পাইলে সে-ও উন্নতি করিতে পারে। অর্থের অপব্যয় অনুচিত এবং স্বদেশজাত সামান্য জিনিষেই পরিতৃপ্ত থাকার সুবিধা- ও মাদক দ্রব্য-ব্যবহারের অপকারিতা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

স্বার্থ-সম্বন্ধীয় কোন উদ্দেশ্য না লইয়া পথে বাহির হওয়ায় আজ যে দুইটি কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে স্বতঃই আসিয়া

উপস্থিত হইল তাহা পালনের জন্য যত চেষ্টা করিতে-ছিলাম, ততই আনন্দ হইতেছিল। প্রফুল্ল অন্তঃকরণে তাহাদের সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার একটি পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণেতর কোন গৃহস্থ-সন্তান, পূর্ব্বে চাকুরি করিত ; এখন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল, এখন সে সামান্য ধুতি ও চাদরেই পরিতুষ্ট। পূর্ব্বে বড়লোক বলিয়া তাহার অভিমান ছিল, এখন নিজ হাতে অনেক টাকা-কড়ি নাড়া-চাড়া করায় তাহার সে অর্থের অভিমান গিয়াছে। পূর্ব্বে সে নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত কদর্য্য ব্যবহার করিত, কথা কহিলে অতিরুক্ষভাবে উত্তর দিত, কিন্তু আজকাল ব্যবসায় করিতে বসিয়া তাহাদের সাহায্য অপরিহার্য্য-জ্ঞানে নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত “বাবা, বাছা” বলিয়া কথা কহিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে সে ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু আজ আমার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে শুভ-আশীর্ব্বাদ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, এমন সময়ে “আমিও ত ঐ পথেই যাইব” বলিয়া সে-ও আমাদের সঙ্গ লইল। তখন আমরা চারি জনে নানা কথা কহিতে কহিতে চলিলাম। সকলেই সেই

আলোচনায় যোগ দিল। দেখিলাম, হীন, নিকৃষ্ট, অশিক্ষিত শূদ্র পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সকল কথাই বুঝিতে পারিল। তাহাদের অধিক চিন্তাশক্তি নাই। ভাবিবার বিষয়ও তাহাদের কিছু ছিল না। সেই জন্য যাহা শুনিল তাহাই করিতে তাহারা প্রস্তুত হইল। তৃতীয় ব্যক্তি বৈশ্য কি ক্ষত্রিয় তাহা জানি না। সংসারের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া, নানা ভাবে দেখিয়া, শুনিয়া ও ঠকিয়া কোন্‌টি মন্দ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কিসে ভাল হইবে তাহা স্থির করিতে সমর্থ হয় নাই। সৎ উপদেশ পাইয়া সেও আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিল।

নানা বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে সে দিন যে কত পথ অতিবাহন করিয়াছিলাম তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পথ চলিতে যে, কোনরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহাও বোধ হইল না। মহৎ উদ্দেশ্যে সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিল বলিয়া কেহ কোন ক্লেশ বোধ করে নাই। পরন্তু সকলের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যেকে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিল। সেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে যখন আমরা এক বৃক্ষতলে বসিলাম, তখন স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ বায়ু

আসিয়া আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিয়াছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কোন ফুলের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। তখন সহসা মনে হইল—এই যে কোন সুদূরস্থিত ফুলের গন্ধ না চাহিতেও বায়ুর সহিত আপনি মিশিয়া আসিয়া আমাদের শরীর-মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিল, সেইরূপ মুক্তি-লাভের উপযুক্ত কার্য্য করিলেই, চাহি বা না চাহি, মুক্তি আপনি আসিয়াই আমাদের সমীপে একদিন উপস্থিত হইবে।

ঐ অজ্ঞাত, অতর্কিত ফুল-গন্ধ যেন বলিল, 'এই যে তুমি আজ স্বার্থ ভুলিলে, নিকৃষ্ট জাতিকে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আপনার করিয়া লইলে, অশিক্ষিতকে সৎ শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া প্রীতির বন্ধনে বাঁধিলে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রেমের সম্মিলন ঘটাইলে, এবং স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও অপর সকল জাতিকে সুশিক্ষা দিয়া তাহাদের উন্নতির পথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, তাই তাহারই ফলে মুক্তির পথ দেখিতে পাইলে। মুক্তি পাইবার জন্য কখনও ব্যস্ত হইও না। আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া যাও, যে দিন মুক্তির প্রকৃত অধিকারী হইবে সেই দিনই বায়ুস্রোতো-

বাহিত পুষ্পগন্ধের মত মুক্তিদাতা আপনিই আসিয়া তোমায় দেখা দিবেন। তোমার মানব-জন্ম সার্থক হইবে! কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে এতটুকু ত্রুটি থাকিতে শত জন্ম ধরিয়া মুক্তি চাহিলেও কোন দিনই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না।'

সমাপ্ত

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য পুস্তকের পরিচয়

মানব-প্রকৃতি

(বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে লিখিত)

সুন্দর কাগজ, নির্ভুল ছাপা, মূল্য ১॥০ টাকা

"মানব-প্রকৃতি"তে সাহিত্য-চর্চ্চার যে পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে চিন্তার যত উপাদান আছে, সংযমের অভাবে সংসার-নাশের চিত্র যেমন দেখান হইয়াছে, নিষ্পাপ সুখের সংসারের প্রতিচ্ছবি যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে—সেরূপ অন্য কোন পুস্তকে কদাচ দেখা যায়। "মানব-প্রকৃতি" পড়িতে পড়িতে প্রতি পত্রে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহার মীমাংসা করিতে আপনার জীবনের ও পারিপার্শ্বিক অনেক ঘটনার আলোচনা করিবার আবশ্যক হয়। শিল্প হিসাবে পড়িলে, চরিত্র ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" পাঠে যে কত আনন্দ পাওয়া যায় তাহা "মানব-প্রকৃতি"তে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। "মানব-প্রকৃতি" পাঠ ও আলোচনা করিলে প্রকৃতই মানব-প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের পুস্তকাগার ও পারিতোষিকের জন্য অনুমোদিত।

"ইহা একখানি নূতন ধরণের সমালোচনা-পুস্তক। ইহা একাধারে সমালোচনা এবং মনস্তত্ত্ব ও চরিত্র-নীতির বই। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির

বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মানব-প্রকৃতির বিচিত্র জটিলতা ও কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।"

—প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৯।

"স্ত্রীলোকই সংসারের প্রকৃত শক্তি। যাহাতে সে শক্তির অপচয় না হয় এবং যে ভাবে সে শক্তি প্রযুক্ত হইলে সংসারের উন্নতি ও সুখ হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা ও আদর্শ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

—ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩২৯।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞান-পরিচয়

সুন্দর কাগজ, পাইকা টাইপে ছাপা, মূল্য ॥০ আনা

রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি সহজ পরীক্ষার দ্বারা সরল ভাষায় এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পরীক্ষা-গুলিতে যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করা হইয়াছে, সেগুলি প্রায়ই সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের সচরাচর ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য। পল্লী-ছাত্রগণও ইচ্ছা করিলে সেই সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ কুটীরেও পুস্তকে লিখিত তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করিতে পারে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রকৃত কর্ম্মঠ ও কার্য্য-কুশল বালকবালিকা পাইতে হইলে এরূপ পুস্তকের প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়। প্রতি সংসারের গৃহকর্ম্মে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা এই পুস্তকে যথাসম্ভব দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক পড়িতে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করিতে বালক-বালিকারা ভার বোধ করিবে না—পুতুল-খেলার মত খেলা করিতে করিতেই বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে।